Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব, ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা সিদ্দিকা

রোলঃ ২৩১০০১২১৭২৪

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব, ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা সিদ্দিকা

রোলঃ ২৩১০০১২১৭২৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব, ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়েশা সিদ্দিকা, আইডিঃ ২৩১০০১২১৭২৪ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব, ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

আয়েশা সিদ্দিকা

আইডিঃ ২৩১০০১২১৭২৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

১ম অধ্যায় 7

১.১ দ্বীনি ইলমের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ পরিচয় 7

১.২ দ্বীনি ইলম ও দুনিয়াবি ইলমের পার্থক্য 10

২য় অধ্যায় 12

২.১ কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইলমের গুরুত্ব 12

২.২ দ্বীনি ইলম অর্জনের ফযীলত 14

২.৩ দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা 19

৩য় অধ্যায় 37

৩.১ ইলম অর্জনের পদ্ধতি ও আদব 37

৩.২ বর্তমান যুগে ইলম অর্জনের উপায় 43

৩.৩ ইলমহীনতার ক্ষতি ও পরিণাম 48

৪র্থ অধ্যায় 54

৪.১ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য ইলমের গুরুত্ব 54

৪.২ ইলম ও আমলের সম্পর্ক 57

৪.৩ দ্বীনি ইলমের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা 60

৪.৪ উপসংহার 62

তথ্যসূত্র 64

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সঠিক পথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করে অন্যান্য সৃষ্টির ঊর্ধ্বে মর্যাদা দিয়েছেন।

ইসলামে ইলম বা জ্ঞান অর্জনকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, যা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার মূল ভিত্তি।

দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর, যিনি জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে উম্মতকে সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।"

[সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস-২২৪]

ইলম হচ্ছে জ্ঞান বা আলো। দ্বীনি ইলম মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে এবং তাকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করে। সূরা যুমার-এর ৯নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?"

অন্য আয়াতে আল্লাহ আরও বলেন,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছ এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা উঁচু করে দেবেন।"

[সূরা আল-মুজাদিলা-১১]

আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা যায় ইলম ও দ্বীনের গুরুত্ব কতটা বেশি। দ্বীনি ইলম অর্জনের মাধ্যমে মুমিন মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং আমলকে সঠিক করতে পারে। সঠিক জ্ঞান ছাড়া কোনো ইবাদতই পরিপূর্ণতা পায় না। নবী করীম (সা.) বলেছেন:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"

[সহীহ মুসলিম, হাদিস-২৬৯৯]

বর্তমান যুগে মুসলিম সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, বিভ্রান্তি ও বিভিন্ন সমস্যার অন্যতম কারণ হলো দ্বীনি ইলম থেকে দূরে থাকা। তাই প্রতিটি মানুষের জন্য প্রয়োজন সঠিক ও সহীহ জ্ঞান অর্জন করা এবং তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা।

মূলত ইলম ও আমল একে অপরের সাথে এমনভাবে জড়িত যে, একটি ছাড়া অন্যটি অর্থহীন। যে আমল জ্ঞান ছাড়া করা হয়, তা প্রায়ই ভুলে ভরা থাকে; আর যে জ্ঞান আমলে রূপান্তরিত হয় না, তা কেবল বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাই ইসলাম আমাদের প্রথমে জ্ঞান, তারপর সেই অনুযায়ী আমলের নির্দেশ দিয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন — "জ্ঞান কথা ও কাজের পূর্বে।"

একটি জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে জাতি যত বেশি জ্ঞানচর্চা করেছে, তারা তত বেশি উন্নতি লাভ করেছে। মুসলিম উম্মাহ যখন কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানকে আঁকড়ে ধরে দুনিয়াবি জ্ঞানেও অগ্রসর হয়েছিল, তখন তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। আর যখন তারা জ্ঞান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তখনই তাদের পতন শুরু হয়েছে। তাই দ্বীনি ইলম কেবল একটি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়, বরং সমগ্র উম্মাহর সম্মান ও মর্যাদার মূল চাবিকাঠি।

দ্বীনি ইলমের মর্যাদা এতই উঁচু যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর নবীকে কেবল একটি বিষয়ে বৃদ্ধির জন্য দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, আর তা হলো ইলম। দুনিয়ার আর কোনো সম্পদ — না ধন, না ক্ষমতা, না খ্যাতি — এর জন্য আল্লাহ নবীকে দু'আ করতে বলেননি। এ থেকে বোঝা যায়, একজন মুমিনের জীবনে জ্ঞানের স্থান কত উঁচুতে হওয়া উচিত।

আমাদের এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য হলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা এবং বর্তমান যুগে এর প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা। আশা করি এই আলোচনা পাঠকের অন্তরে জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ সৃষ্টি করবে এবং তাকে দ্বীনি ইলমের পথে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করবে।

এখানে আমি দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব, ফযীলত এবং ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করব। পাশাপাশি কুরআন ও হাদিসের আলোকে এর বাস্তব প্রয়োগ এবং করণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরা হবে।

১ম অধ্যায়

১.১ দ্বীনি ইলমের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

'ইলম' শব্দটি আরবি ভাষায় ع,ل,م

মূলধাতু থেকে উদ্ভূত। আভিধানিক অর্থে ইলম বলতে বোঝায় — জানা, অবগত হওয়া, উপলব্ধি করা, কোনো বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। আরবি অভিধানে ইলমের বিপরীত শব্দ হলো 'জাহল', অর্থাৎ অজ্ঞতা।

আরবি ভাষাবিদগণ বলেন, ইলম হলো কোনো বিষয়কে তার প্রকৃত রূপে অনুধাবন করা — যা ধারণা বা অনুমানের বিপরীত। কুরআনে 'ইলম' এবং এর সমার্থক শব্দসমূহ প্রায় সাড়ে সাতশো বার ব্যবহৃত হয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় ইসলামে জ্ঞানের স্থান কত উঁচুতে।

পারিভাষিক অর্থ

ইসলামি পরিভাষায় 'ইলম' বলতে বোঝায় এমন জ্ঞান যা কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামি শরীয়তের মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং যা মানুষকে আল্লাহর পরিচয়, তাঁর বিধান, ইবাদাত-বন্দেগি, হালাল-হারাম এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথ দেখায়।

ইমাম গাযালী (রহ.) "ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন" গ্রন্থে বলেন, দ্বীনি ইলম এমন এক আলো, যা অন্তরে প্রবেশ করলে আল্লাহর প্রতি ভয় ও মুহাব্বত সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতপক্ষে দ্বীনি ইলমের সংজ্ঞা কেবল তথ্য মুখস্থ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি এমন এক উপলব্ধি যা মানুষের অন্তর, কথা ও কাজকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন —

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

"আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; আর ফেরেশতাগণ ও জ্ঞানীগণও (এই সাক্ষ্য দেন), যারা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

[সূরা আলে ইমরান – ১৮]

এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে ফেরেশতাদের সাথে জ্ঞানীদের নাম উল্লেখ করেছেন — যা প্রকৃত আলেমদের অপরিসীম মর্যাদার প্রমাণ। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, দ্বীনি ইলম এমন এক সম্পদ যা মানুষকে সত্যের সাক্ষ্যদানের যোগ্য করে তোলে।

ইলমের প্রকারভেদ

ইলমকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়। নিচে প্রধান শ্রেণিবিভাগগুলো আলোচনা করা হলো —

প্রথমত, ইলমকে শারঈ (ধর্মীয়) ও গায়রে শারঈ (দুনিয়াবি) — এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

➤ শারঈ ইলম

যে জ্ঞান সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত, তাকে শারঈ ইলম বলে। যেমন — তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও আকিদা। এই ইলম মানুষের ঈমান ও আমলকে শুদ্ধ করে এবং আখিরাতে সফলতা অর্জনের পথ দেখায়।

শারঈ ইলমই হলো সেই জ্ঞান যা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর কোনো না কোনো পর্যায়ে আবশ্যক। কারণ এই জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর ইবাদত সঠিকভাবে আদায় করা সম্ভব নয়। রাসূল (সা.) বলেছেন —

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।"

[সহীহ বুখারী – ৭১]

➤ গায়রে শারঈ (দুনিয়াবি) ইলম

যে জ্ঞান দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করে, তাকে গায়রে শারঈ ইলম বলা হয়। যেমন — চিকিৎসা, কৃষি, প্রযুক্তি ইত্যাদি। এই জ্ঞানও গুরুত্বপূর্ণ, তবে এর মূল্য নির্ভর করে নিয়তের উপর।

ইসলাম দুনিয়াবি জ্ঞানকে কখনও নিরুৎসাহিত করেনি। বরং একটি সমাজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ থাকা ফরযে কিফায়া। যদি কোনো মুসলিম সৎ নিয়তে — উম্মাহর কল্যাণের উদ্দেশ্যে — এসব জ্ঞান অর্জন করে, তবে তার এই দুনিয়াবি জ্ঞানও ইবাদতে পরিণত হয় এবং সে সওয়াব লাভ করে।

দ্বিতীয়ত, দায়িত্বের ভিত্তিতে ইলমকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়।

➤ ফরযে আইন

যে জ্ঞান প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জানা বাধ্যতামূলক, তাকে ফরযে আইন বলে। যেমন — নামায, রোযা, ঈমানের মৌলিক বিষয়াদি।

একজন মুসলিম যা প্রতিদিন আমল করে — যেমন সালাত, অযু, পবিত্রতা — সে সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান অর্জন করা তার উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরয। এই জ্ঞান কেউ তার পক্ষ থেকে আদায় করতে পারে না।

এই কারণেই রাসূল (সা.) জ্ঞান অর্জনকে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন —

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।"

[সুনানে ইবনে মাজাহ – ২২৪]

এই হাদিসে যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, তা মূলত ফরযে আইন জ্ঞান — অর্থাৎ যে জ্ঞান ছাড়া একজন মুসলিম তার দৈনন্দিন ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে পারে না। প্রতিটি মুসলিমের উচিত অন্তত এই পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা, যা দিয়ে সে তার ঈমান, ইবাদত ও দৈনন্দিন জীবনের শরয়ী বিধান সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

➤ ফরযে কিফায়া

যে জ্ঞান সমাজের কিছু লোক অর্জন করলেই দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়, তাকে ফরযে কিফায়া বলে। যেমন — জানাযার নামায।

ফিকহের গভীর জ্ঞান, ফতোয়া প্রদানের যোগ্যতা, কুরআনের তাফসির, হাদিস যাচাই — এসব উচ্চতর জ্ঞান সমাজের একটি অংশ অর্জন করলে সবার পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। তবে সমাজে যদি কেউই এই জ্ঞান অর্জন না করে, তাহলে গোটা সমাজ গুনাহগার হবে।

উপকারিতার ভিত্তিতে ইলম ২ প্রকার —

১. ইলমে নাফে'

যে জ্ঞান মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে উপকার সাধনে সাহায্য করে, তাকে ইলমে নাফে' বলে।

ইলমে নাফে' এমন জ্ঞান যা অন্তরে আল্লাহভীতি জাগায়, আমলে উৎসাহিত করে এবং মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করে। রাসূল (সা.) প্রতিদিন এই দু'আ করতেন —

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী ইলম প্রার্থনা করি এবং অনুপকারী ইলম থেকে আপনার আশ্রয় চাই।"

[সুনানে ইবনে মাজাহ – ৩৮৪৩]

২. ইলমে গায়রে নাফে‘

যে জ্ঞান কোনো উপকারে আসে না, বরং ক্ষতির কারণ হয়, তাকে ইলমে গায়রে নাফে‘ বলে।

যেমন — জাদুবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, কুসংস্কারমূলক বিদ্যা ইত্যাদি, যা মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। এমন জ্ঞান অর্জন করা থেকে রাসূল (সা.) আশ্রয় চেয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায়, সব জ্ঞানই প্রশংসনীয় নয় — কেবল সেই জ্ঞানই মূল্যবান যা আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির কল্যাণে ব্যবহৃত হয়।

১.২ দ্বীনি ইলম ও দুনিয়াবি ইলমের পার্থক্য

দ্বীনি ইলম ও দুনিয়াবি ইলম উভয় প্রকার ইলমেরই আমাদের জন্য গুরুত্ব রয়েছে। তবে প্রকৃতিগত দিক থেকে এদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

দ্বীনি ইলম

আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর বিধান জানার মাধ্যম এই ইলম। এই ইলম অর্জনের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ সাধন করা যায়। কুরআন, হাদিস, ফিকহ, আকিদা, তাফসির, তাসাউফ ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা যায়। প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রয়োজন অনুসারে এই জ্ঞান অর্জন করা ফরয।

দুনিয়াবি ইলম

দুনিয়ার জীবন পরিচালনা ও মানবকল্যাণের জন্য এই ইলম প্রয়োজন। এই ইলম হলো বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, প্রকৌশল, অর্থনীতি ইত্যাদি জাগতিক বিষয়। দুনিয়াবি ইলমে নিয়ত ঠিক করলে এতেও সওয়াব অর্জন করা যায়।

মূল পার্থক্য হলো অগ্রাধিকারে। দ্বীনি ইলম হলো মূল, আর দুনিয়াবি ইলম তার সহযোগী। একজন মুসলিম দুনিয়াবি জ্ঞানে যত বড় বিশেষজ্ঞই হোক না কেন, যদি তার দ্বীনি জ্ঞান না থাকে, তবে সে জানবে না কীভাবে সেই জ্ঞানকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করতে হয়। অপরদিকে দ্বীনি জ্ঞান থাকলে একজন মানুষ তার সমস্ত দুনিয়াবি কাজকেও ইবাদতে রূপান্তরিত করতে পারে। তাই উভয় ইলমকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে, দ্বীনি ইলমকে কেন্দ্রে রেখে দুনিয়াবি ইলম অর্জন করাই একজন আদর্শ মুসলিমের কর্তব্য।

উভয় ইলমের সমন্বয়

ইসলাম দ্বীনি ও দুনিয়াবি জ্ঞানের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখে না। বরং ইসলামের ইতিহাসে আমরা দেখি যে, মহান মুসলিম মনীষীরা একই সাথে উভয় জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা যেমন কুরআন-হাদিসের গভীর জ্ঞান রাখতেন, তেমনি চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞানেও অবদান রেখেছেন। তাঁদের কাছে দুনিয়াবি জ্ঞান ছিল দ্বীনি লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে প্রকৃতির নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করার আহ্বান জানিয়েছেন, যা মূলত দুনিয়াবি জ্ঞানচর্চারও উৎসাহ। তিনি বলেন —

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

"নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।"

[সূরা আলে ইমরান – ১৯০]

এই আয়াতে আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করার আহ্বান জানিয়েছেন — যা বিজ্ঞান ও জ্ঞানচর্চার ভিত্তি। অর্থাৎ একজন মুমিন যখন দুনিয়াবি জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন করে, তখন তা তার ঈমানকে আরও দৃঢ় করে। এভাবে দ্বীনি ও দুনিয়াবি জ্ঞান একে অপরের পরিপূরক হয়ে একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলিম গড়ে তোলে।

২য় অধ্যায়

২.১ কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইলমের গুরুত্ব

ইসলামে ইলম বা জ্ঞান অর্জন একটি ফরয বিধান। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর প্রথম যে ওহী নাযিল করেছিলেন, তার শুরু হয়েছিল জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়ে।

রমযান মাসে হেরা গুহায় যখন জিব্রাইল (আ.) এসে রাসূল (সা.)-কে জড়িয়ে ধরে বললেন 'ইকরা' — 'পড়ো'। তখন কিছুই ফরয হয়নি — নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি। আল্লাহর প্রথম নির্দেশ ছিল এটাই — পড়ো অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করো।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

[সূরা আল-আলাক ১–৫]

অনুবাদ: "পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে আলাক (জমাট রক্ত) থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ো, তোমার প্রতিপালক মহা-মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানত না।"

এই আয়াতে 'ইকরা' শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে — যা গুরুত্বের দিক থেকে জোর প্রদান করে। আল্লাহ কলমের কথা বলেছেন, যা লেখাপড়া বা জ্ঞানের প্রতীক। এই প্রথম ওহী থেকেই বোঝা যায় ইলমের গুরুত্ব।

লক্ষণীয় যে, ইসলামের প্রথম নির্দেশটি ছিল না নামাযের, না রোযার, না অন্য কোনো ইবাদতের — বরং তা ছিল 'পড়ো' অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ। এটি প্রমাণ করে যে, যেকোনো ইবাদতের পূর্বশর্ত হলো জ্ঞান। আল্লাহ কুরআনের অন্যত্র 'কলম'-এর শপথও করেছেন, যা জ্ঞান ও লেখনীর মর্যাদাকে আরও স্পষ্ট করে। তিনি বলেন —

ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

"নূন। শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে।"

[সূরা আল-কলম – ১]

মহান আল্লাহ কলমের শপথ করেছেন — যা জ্ঞান ও লেখনীর অসামান্য মর্যাদার প্রমাণ। কারণ আল্লাহ কেবল মহান বিষয়ের শপথ করেন। কলমের মাধ্যমেই জ্ঞান সংরক্ষিত হয় এবং এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। তাই ইসলামে লেখাপড়া ও জ্ঞানচর্চার স্থান সর্বোচ্চ।

সূরা আল-মুজাদালা-এর ১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

অনুবাদ: "আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছ এবং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন বহু স্তরে।"

আল্লাহ বলেন, অনেক মানুষ না জেনে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। শয়তান সম্পর্কে লিখে দেওয়া হয়েছে, যে কেউ তার সাথি হবে, শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং দোযখের আযাবের দিকে পরিচালিত করবে।

[সূরা হজ্জ – ৩-৪]

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় — না জেনে বিতর্কে জড়ানো শয়তানি কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এর পরিণাম মন্দ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা সূরা বনি ইসরাইল-এর ৩৬ নম্বর আয়াতে বলেন —

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অনুবাদ: যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পেছনে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চক্ষু ও হৃদয় — এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।

অর্থাৎ, যে ব্যাপারে তোমার জ্ঞান নেই তার পেছনে পড়ো না। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির (রহিমাহুল্লাহ) সালাফদের উদ্ধৃতি টেনে বলেন — আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানশূন্য অবস্থায় কথা বলতে নিষেধ করেছেন। এমনকি দ্বিধা-সংশয় এবং ধারণাপ্রসূত হয়ে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

তাফসিরে ইবনে কাসিরে বলা হয়েছে, মানুষ চক্ষু, কর্ণ ও অন্তর অর্থাৎ প্রত্যেকটির কাছে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে। দেহাঙ্গ ব্যবহার করে যেসব কাজ সম্পাদন করা হয়েছে, সে ব্যাপারে জবাবদিহি করা হবে।

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বারবার চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞানার্জনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন —

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তরে তালা লাগানো আছে?"

[সূরা মুহাম্মাদ – ২৪]

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, কুরআন বোঝা ও তা নিয়ে গভীর চিন্তা করা প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব। আর কুরআন বুঝতে হলে প্রয়োজন জ্ঞান। জ্ঞান ছাড়া কুরআনের গভীর অর্থ উপলব্ধি করা অসম্ভব।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, জ্ঞানীরাই কেবল আল্লাহর নিদর্শনাবলী থেকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে —

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

"আর এই দৃষ্টান্তগুলো আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করি, কিন্তু জ্ঞানীগণ ছাড়া কেউ তা অনুধাবন করতে পারে না।"

[সূরা আল-আনকাবূত – ৪৩]

সুতরাং কুরআনের শিক্ষা, আল্লাহর নিদর্শন এবং দ্বীনের গভীর তত্ত্ব অনুধাবন করার যোগ্যতা কেবল জ্ঞানীদেরই রয়েছে। এ থেকেই দ্বীনি ইলমের অপরিসীম গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২.২ দ্বীনি ইলম অর্জনের ফযীলত

কুরআনের আলোকে ইলমের ফযীলত

ইলমে দ্বীন অর্জন করা হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির মাধ্যম, ক্ষমা ও মুক্তির পথ এবং জান্নাতে প্রবেশের জামানত স্বরূপ। পবিত্র কুরআনের আলোকে বহু আয়াতে ইলম ও আলেমের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত উপস্থাপন করা হলো:

কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত শব্দটিই ছিল 'পড়ো' — যা জ্ঞান অর্জনের প্রতি সরাসরি আহ্বান। এ থেকেই বোঝা যায় যে, ইলম ইসলামের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানীদের বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন এবং তাঁদের প্রকৃত বিনয়ী ও আল্লাহভীরু বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আলেমের মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আলেম ও অজ্ঞদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করেছেন। যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে সে আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

"বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? নিশ্চয়ই উপদেশ গ্রহণ করে কেবল বুদ্ধিমানরা।"

[সূরা যুমার – ৯]

সূরা আলে-ইমরান ১৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে নিজের ও ফেরেশতাদের সাথে আলেমদের নাম উল্লেখ করেছেন — যা আলেমদের অপরিসীম মর্যাদার প্রমাণ।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-মুজাদালা-এর ১১ নম্বর আয়াতে বলেছেন —

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের ইলম দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা বহু স্তরে উন্নীত করবেন।"

এই আয়াতে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ কেবল ঈমানদারদের মর্যাদা বৃদ্ধির কথা বলেননি, বরং বিশেষভাবে যাদের ইলম দান করা হয়েছে তাদের মর্যাদা উঁচু করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ জ্ঞান একজন ঈমানদারের মর্যাদাকে আরও উঁচুতে নিয়ে যায়। সাধারণ মুমিন ও জ্ঞানী মুমিনের মধ্যে এই মর্যাদার পার্থক্য দ্বীনি ইলমের শ্রেষ্ঠত্বেরই প্রমাণ। তাই প্রতিটি মুমিনের আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করা।

ইলমের জন্য দোয়া

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা.)-কে কেবল একটি বিষয় বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে বলেছেন। আর তা হলো — ইলম।

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"আর বলো, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।"

[সূরা ত্বহা – ১১৪]

লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে সম্পদ, ক্ষমতা বা অন্য কোনো কিছু বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে বলেননি — কেবল জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বলেছেন। এটিই প্রমাণ করে যে, জ্ঞানের চেয়ে মূল্যবান আর কোনো সম্পদ নেই। যে নবী ইতিমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী, তাঁকেও আরও জ্ঞানের জন্য দোয়া করতে বলা হয়েছে — তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা ও দোয়া কতটা জরুরি, তা সহজেই বোঝা যায় ।

নবী করীম (সা.) নিজেও জ্ঞানের জন্য বিশেষ দোয়া করতেন এবং সাহাবাদের শেখাতেন। তিনি উম্মতকে শিখিয়েছেন যে, জ্ঞান অর্জনের পথে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া

সফলতা আসে না। তাই প্রতিটি তালিবুল ইলমের উচিত জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি নিয়মিত আল্লাহর কাছে উপকারী জ্ঞান প্রার্থনা করা।

হাদিসের আলোকে ইলমের ফযীলত

রাসূল (সা.) অসংখ্য হাদিসে দ্বীনি ইলমের ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। নিচে অল্প কিছু বর্ণনা করা হলো —

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।"

[সুনানে ইবনে মাজাহ – ২২৪]

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি ইলমের অন্বেষণে কোনো পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"

[সহীহ মুসলিম – ২৬৯৯]

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

"আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী"।

[আবু দাউদ ৩৬৪১, তিরমিযী – ২৬৮২]

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ

"আবেদের উপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব এমন, যেমন পূর্ণিমার চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য নক্ষত্রের উপর।"

[আবু দাউদ – ৩৬৪১]

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ۚ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়, কেবল তিনটি ছাড়া — সদকায়ে জারিয়াহ, এমন ইলম যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, এবং সৎ সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।"

[সহীহ মুসলিম – ১৬৩১]

এই হাদিসটি দ্বারা বোঝা যায় যে, দ্বীনি ইলম এমন এক সম্পদ, যার সওয়াব মৃত্যুর পরও বান্দার আমলনামায় যুক্ত হতে থাকে।

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।"

[সহীহ বুখারী – ৭১]

সাহাবা ও সালাফদের মতে ইলমের ফযীলত

সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী যুগের সালাফে সালেহীনগণ দ্বীনি ইলমের ফযীলত সম্পর্কে যে অমূল্য বাণী দিয়েছেন, তার কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হলো —

হযরত আলী (রা.) বলেন —

"ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম। কারণ ইলম তোমাকে রক্ষা করে, আর তুমি সম্পদকে রক্ষা করো। সম্পদ ব্যয়ে কমে যায়, কিন্তু ইলম বিতরণে বেড়ে যায়।"

হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন —

"তুমি জ্ঞানদানকারী হও, অথবা জ্ঞানার্থী হও, অথবা শ্রবণকারী হও, কিন্তু চতুর্থ হয়ো না (অর্থাৎ ইলম থেকে বিমুখ থাকা ব্যক্তি) নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন —

"যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের কষ্ট বিচ্ছুরণের জন্য বরণ করল না, সে সারাজীবন অজ্ঞতার অপমান বহন করবে।"

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন —

"ইলম মুখস্থ করার বিষয় নয়, বরং ইলম এমন এক আলো যা আল্লাহ অন্তরে স্থাপন করেন।"

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মানুষের কতটুকু জ্ঞান প্রয়োজন? তিনি উত্তর দিলেন —

"যতটুকু জ্ঞান থাকলে সে তার দ্বীন সঠিকভাবে পালন করতে পারে, ততটুকু জ্ঞান অর্জন করা তার উপর অপরিহার্য।"

সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) বলতেন —

"ইলম সকল নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম; কারণ ইলম তোমাকে আল্লাহর ইবাদত সঠিকভাবে শেখায়।"

এসব মনীষীর বাণী থেকে স্পষ্ট হয় যে, প্রকৃত আলেমগণ জ্ঞানকে কেবল তথ্য হিসেবে নয়, বরং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে দেখতেন। তাঁদের কাছে জ্ঞান ছিল আমলের ভিত্তি এবং আল্লাহভীতির উৎস। তাঁরা জ্ঞানকে সম্পদ, পদ বা খ্যাতির চেয়েও মূল্যবান মনে করতেন।

ইলম অন্বেষণকারীর জন্য সৃষ্টিজগতের দু'আ

দ্বীনি ইলমের ফযীলত এতটাই উঁচুতে যে, ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আসমান-যমিনের সকল সৃষ্টি ক্ষমা প্রার্থনা করে। রাসূল (সা.) বলেছেন —

وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ

"নিশ্চয়ই আলেমের জন্য আসমান ও যমিনের সবকিছু — এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত — ক্ষমা প্রার্থনা করে।"

[সুনানে আবু দাউদ – ৩৬৪১]

কত বড় মর্যাদা! একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আকাশের ফেরেশতা থেকে শুরু করে সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে দু'আ করে। এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে। এমনকি ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। রাসূল (সা.) বলেছেন —

وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ

"নিশ্চয়ই ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ডানাগুলো বিছিয়ে দেন।"

[সুনানে আবু দাউদ – ৩৬৪১]

এই হাদিসগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, দ্বীনি ইলম অর্জনের পথ এমন এক সম্মানের পথ, যেখানে চলার অর্থ হলো জান্নাতের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং গোটা সৃষ্টিজগতের ভালোবাসা ও দু'আ অর্জন করা।

ইলমের মাধ্যমে নেতৃত্ব ও মর্যাদা

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যারা দ্বীনি ইলমে অগ্রসর হয়েছেন, আল্লাহ তাঁদের জাতির নেতৃত্ব দান করেছেন। দ্বীনি জ্ঞান একজন সাধারণ মানুষকে উম্মাহর পথপ্রদর্শকে পরিণত করতে পারে। রাসূল (সা.) বলেছেন —

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কিতাব (কুরআনের জ্ঞান) দ্বারা কিছু জাতিকে উন্নত করেন এবং কিছু জাতিকে অবনত করেন।"

[সহীহ মুসলিম – ৮১৭]

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, কুরআনের জ্ঞান একটি জাতির উত্থান-পতনের নিয়ামক। যে জাতি এই জ্ঞান ধারণ করে ও তার উপর আমল করে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা দান করেন; আর যে জাতি এ থেকে বিমুখ হয়, তারা লাঞ্ছিত হয়। সাহাবায়ে কেরাম এর

জ্বলন্ত প্রমাণ — তাঁরা জ্ঞান ও আমলের মাধ্যমে আরব মরুভূমি থেকে উঠে এসে গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের চাবিকাঠি

দ্বীনি ইলম কেবল আখিরাতের জন্য নয়, বরং দুনিয়ার জীবনেও কল্যাণের চাবিকাঠি। যে ব্যক্তি দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করে, সে জানে কীভাবে সৎভাবে জীবনযাপন করতে হয়, কীভাবে হালাল উপার্জন করতে হয় এবং কীভাবে পরিবার ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন —

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

"যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, এবং সে মুমিন হয়, তবে আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব।"

[সূরা আন-নাহল – ৯৭]

এই পবিত্র ও কল্যাণময় জীবন কেবল তখনই সম্ভব যখন একজন মানুষ জানে কোন কাজ সৎ আর কোন কাজ অসৎ। আর এই জ্ঞান আসে দ্বীনি ইলম থেকে। তাই দ্বীনি ইলম দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের সফলতার মূল ভিত্তি।

২.৩ দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

ব্যক্তি জীবনে দ্বীনি ইলমের প্রয়োজনীয়তা

একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনই সকল সাফল্য বা ব্যর্থতার মূল কেন্দ্র। যদি ব্যক্তি নিজেই দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবে তার ঘর, পরিবার, সমাজ — কিছুই কল্যাণময় হতে পারে না। তাই সর্বপ্রথম আমরা ব্যক্তি জীবনে দ্বীনি ইলমের অপরিহার্যতার দিকগুলো বিশ্লেষণ করব।

একজন মানুষ যখন দুনিয়াতে আসে, তখন সে কিছুই জানে না। আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা দিয়েছেন, যেন সে নিজের স্রষ্টাকে চিনতে পারে এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারে। আল্লাহ বলেন —

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

"আল্লাহ তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে বের করেছেন এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না; আর তিনি তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর দান করেছেন।"

[সূরা আন-নাহল – ৭৮]

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, মানুষ জন্মগতভাবে জ্ঞানহীন, কিন্তু আল্লাহ তাকে জ্ঞান অর্জনের উপকরণ — কান, চোখ ও অন্তর — দান করেছেন। এই উপকরণগুলো ব্যবহার করে জ্ঞান অর্জন করা এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী জীবন গড়াই মানুষের কর্তব্য। ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে — আকীদা, ইবাদত, চরিত্র, লেনদেন — দ্বীনি জ্ঞান একটি অপরিহার্য পথপ্রদর্শক।

১. সঠিক আকীদা গঠনে দ্বীনি ইলমের ভূমিকা

একজন মুসলিমের সবচেয়ে মৌলিক দায়িত্ব হলো বিশুদ্ধ আকীদা ধারণ করা। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে, তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে, ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল, আখিরাত এবং তাকদীর সম্পর্কে সঠিক বিশ্বাস ছাড়া কোনো ইবাদতই গৃহীত হয় না। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন —

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

"জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া সত্য ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের গুনাহের জন্য।"

অর্থাৎ, এই আয়াতে আল্লাহ 'ইস্তিগফার'-এর পূর্বে 'জেনে রাখো' (ফা'লাম) বলেছেন, অর্থাৎ আমলের পূর্বে জ্ঞান। আকীদার ক্ষেত্রে অজ্ঞতা মানুষকে অনেক সময় শিরক, বিদআত ও কুফরের দিকে নিয়ে যায়। অথচ ব্যক্তি বুঝতেই পারে না সে কী করছে। বর্তমান যুগে কবর পূজা, পীরের দরবারে সিজদা, তাবিজ-কবচের অন্ধবিশ্বাস, ভাগ্য বদলানোর নামে কুসংস্কার — অপরাধের পেছনের মূল কারণই হলো বিশুদ্ধ তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞতা। সুতরাং সঠিক ইলম অর্জনের মাধ্যমেই সম্ভব সঠিক আকীদা অর্জন করা।

আকীদা হলো ইমারতের ভিত্তির মতো। ভিত্তি দুর্বল হলে যত সুন্দর ইমারতই গড়া হোক না কেন, তা টিকবে না। তেমনি আকীদা শুদ্ধ না হলে যত আমলই করা হোক, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন —

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"যে ব্যক্তি ঈমান প্রত্যাখ্যান করে, তার সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যায় এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

[সূরা আল-মায়িদা – ৫]

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, বিশুদ্ধ আকীদা ছাড়া কোনো আমলেরই মূল্য নেই। আর বিশুদ্ধ আকীদা অর্জনের একমাত্র উপায় হলো সঠিক দ্বীনি ইলম। তাই প্রতিটি মুসলিমের সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো তাওহীদ ও আকীদার সঠিক জ্ঞান অর্জন করা।

২. সহীহ ইবাদত আদায়ে দ্বীনি ইলম

ইসলামে যেকোনো ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। একটি ইখলাস (একনিষ্ঠতা) এবং দ্বিতীয়টি হলো সুন্নাত তরীকা (রাসূল (সা.)-এর তরীকা অনুসরণ)। দ্বিতীয়টি পূরণ করতে হলে অবশ্যই জানতে হবে রাসূল (সা.) কীভাবে ইবাদত আদায় করেছেন।

নবী (সা.) বলেন —

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"তোমরা যেভাবে সালাত আদায় করো, যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখেছো।"

[সহীহ বুখারী]

হজ্জ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন —

لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ

"তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ্জের আমল শিখে নাও।"

[সহীহ মুসলিম]

ফলে যে ব্যক্তি অযুর ফরয, সালাতের রুকন, রোযার মাসআলা, যাকাতের নিসাব বা হজ্জের কাঠামো জানে না — তার ইবাদতই হয় ত্রুটিপূর্ণ, নয়তো বাতিল।

রাসূল (সা.) একদিন এক ব্যক্তিকে দ্রুত সালাত পড়তে দেখলেন, তার রুকু-সিজদা যথাযথ ছিল না। নবীজী (সা.) তাকে তিনবার ফিরিয়ে দিয়ে বললেন — "যাও সালাত পড়ো — কারণ তুমি সালাতই পড়োনি।" নবী (সা.) তাকে সালাতের সঠিক পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন।

[সহীহ বুখারী]

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট কেবল আবেগ ও আন্তরিকতাই যথেষ্ট নয়, ইবাদতের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা জরুরি।

আল্লাহ তা'আলা একটি ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত হিসেবে উত্তম আমলের কথা বলেছেন — আর উত্তম আমল কেবল জ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভব। তিনি বলেন —

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম আমলকারী।"

[সূরা আল-মুলক – ২]

ইমাম ফুদাইল ইবনে ইয়াদ (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন — 'আহসানু আমালা' (সর্বোত্তম আমল) মানে সেই আমল যা সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও সবচেয়ে সঠিক। বিশুদ্ধ

হওয়ার অর্থ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য করা, আর সঠিক হওয়ার অর্থ সুন্নাহ অনুযায়ী করা। আর সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে হলে অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে। তাই জ্ঞান ছাড়া কোনো ইবাদত পূর্ণাঙ্গভাবে কবুল হয় না।

৩. আল্লাহভীতি ও তাকওয়া অর্জনে

দ্বীনি ইলমের অন্যতম সর্বোচ্চ ফল হলো অন্তরে আল্লাহভীতি জাগ্রত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন —

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমগণই তাঁকে যথাযথ ভয় করেন।"

[সূরা ফাতির – ২৮]

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতের তাফসিরে লেখেন — "আল্লাহকে ভয় কেবল তারাই করেন, যারা তাঁকে যথাযথভাবে চিনেছেন; আর যারা তাঁকে যেমন চিনেছেন, তাঁদের ভয়ও তত গভীর।"

[তাফসীর ইবনে কাসির]

হাসান বসরী (রহ.) বলতেন — "প্রকৃত আলেম তিনিই, যিনি অদৃশ্য আল্লাহকে ভয় করেন, আল্লাহ যা পছন্দ করেন তার দিকে আগ্রহী হন এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা থেকে দূরে থাকেন।" সুতরাং যে ইলম অন্তরে আল্লাহভীতি জাগায় না, সালাফদের ভাষায় তা প্রকৃত ইলম নয়, তা কেবল মুখস্থ তথ্য মাত্র।

তাকওয়া ও ইলমের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। যত বেশি একজন মানুষ আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে জানে, তত বেশি সে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের জন্য কুরআনকে পথপ্রদর্শক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন —

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

"এই সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই; এটি মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক।"

[সূরা আল-বাকারা – ২]

কুরআনের জ্ঞান থেকে হিদায়াত লাভ করে মুত্তাকীরা, আর তাকওয়া অর্জিত হয় জ্ঞানের মাধ্যমে। এভাবে ইলম ও তাকওয়া একে অপরকে শক্তিশালী করে। একজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে, আর সেই ভয়ই তাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে ও সৎকর্মে উৎসাহিত করে।

৪. আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন

দ্বীনি ইলম মানুষকে তার নিজের অন্তর চিনতে সাহায্য করে — কোনটা রিয়া, কোনটা হিংসা, কোনটা অহংকার, কোনটা ঈর্ষনতা, কোনটা গীবত। এসব ভিতরের ব্যাধি না চিনে আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়। রাসূল (সা.) বলেন — "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।"

[সহীহ বুখারী – ৭১]

দ্বীনি ইলম ছাড়া উত্তম চরিত্র গঠনের পথ-নির্দেশও পাওয়া যায় না। কোন আচরণ মাকরূহ, কোনটি অপ্রয়োজনীয়, কীভাবে বাবা-মায়ের সাথে কথা বলতে হবে, কীভাবে প্রতিবেশীর হক আদায় করতে হবে — এ সবই দ্বীনি ইলমের শাখা।

রাসূল (সা.) নিজেই তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে চরিত্র গঠনের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন —

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"আমি তো কেবল উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।"

[মুসনাদে আহমাদ – ৮৯৫২]

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, উত্তম চরিত্র ইসলামের একটি মূল লক্ষ্য। আর কোন আচরণ উত্তম এবং কোনটি নিন্দনীয় — তা জানার জন্য দ্বীনি জ্ঞান অপরিহার্য। জ্ঞান ছাড়া একজন মানুষ ভালো-মন্দের পার্থক্যই করতে পারে না, ফলে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৫. পাপ ও শয়তানের ধোঁকা থেকে আত্মরক্ষায়

শয়তান সবচেয়ে সহজে ধোঁকা দেয় অজ্ঞ ব্যক্তিকে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে —

فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

"একজন আলেম শয়তানের কাছে এক হাজার আবেদের চেয়ে কঠিন।"

[সুনানে তিরমিযী – ২৬৮১]

দ্বীনি ইলম থাকার ফলে ব্যক্তি জানে — কোনটি সন্দেহজনক, কোনটি স্পষ্ট হারাম, কোনটি বিদআত, কোনটি সুন্নাহ। এজন্য শয়তান সহজে ধোঁকা দিতে পারে না।

রাসূল (সা.) হালাল ও হারামের মাঝখানে সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন —

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

"হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট; আর এ দুইয়ের মাঝখানে রয়েছে কিছু সন্দেহজনক বিষয়, যা অনেক মানুষই জানে না।"

[সহীহ বুখারী – ৫২]

এই হাদিসে রাসূল (সা.) স্পষ্ট করেছেন যে, সন্দেহজনক বিষয়গুলো অনেক মানুষই জানে না — অর্থাৎ এগুলো চেনার জন্য জ্ঞান প্রয়োজন। যে ব্যক্তির দ্বীনি জ্ঞান নেই, সে সহজেই সন্দেহজনক ও হারাম বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে। আর যে জ্ঞানী, সে এসব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। তাই দ্বীনি ইলম পাপ থেকে বাঁচার একটি শক্তিশালী ঢাল।

৬. আখিরাতের চিরন্তন প্রস্তুতিতে

মানুষ এই দুনিয়ায় কয়েক দিনের অতিথি — কিন্তু আখিরাত চিরন্তন। দ্বীনি ইলমই সেই পথ-নির্দেশিকা, যা মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য প্রস্তুত করে। রাসূল (সা.) বলেন —

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ۚ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"মানুষ মারা গেলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় — তিনটি ব্যতীত: সদকায়ে জারিয়াহ, এমন ইলম যা থেকে উপকৃত হওয়া হয়, এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।"

[সহীহ মুসলিম – ১৬৩১]

এই হাদিস প্রমাণ করে — মৃত্যুর পরও সদকায়ে জারিয়ার মতো ইলম মানুষের আমলনামায় সওয়াব যোগ করতে থাকে।

নবী করীম (সা.) আরও বলেছেন —

"যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"

[সহীহ মুসলিম – ২৬৯৯]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন —

"মানুষ ইলমের প্রয়োজন বোধ করে আহার ও পানির চেয়েও বেশি।"

কারণ আহার-পানি দিনে দু-তিনবার দরকার হয়, কিন্তু ইলম প্রতিটি মুহূর্তে — প্রতিটি কথা, কাজ এবং সিদ্ধান্তের সময়ে দরকার হয়।

আখিরাতে জ্ঞানীদের মর্যাদা হবে সর্বোচ্চ। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় জ্ঞান অর্জন করেছে এবং সেই অনুযায়ী আমল করেছে, আখিরাতে তার স্থান হবে উঁচুতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন —

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?"

[সূরা যুমার – ৯]

দুনিয়ায় যেমন জ্ঞানী ও অজ্ঞ সমান নয়, আখিরাতেও তারা সমান হবে না। জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষ পুরস্কার। তাই যে ব্যক্তি আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে চায়, তার সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা ও সেই অনুযায়ী আমল করা। কারণ এই জ্ঞানই হবে তার পরকালীন মুক্তির পাথেয়।

৭. সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ে

বর্তমান যুগ তথ্যের যুগ। চারদিক থেকে অসংখ্য মত, পথ ও দাবি মানুষের কাছে এসে পৌঁছায়। কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা, কোনটি সুন্নাহ আর কোনটি বিদআত — এই পার্থক্য নির্ণয় করার একমাত্র মাপকাঠি হলো সহীহ দ্বীনি ইলম। আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে 'ফুরকান' অর্থাৎ সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী নামে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ বলেন —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে তিনি তোমাদের জন্য সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার ক্ষমতা দান করবেন।"

[সূরা আল-আনফাল – ২৯]

এই পার্থক্য করার ক্ষমতা আসে তাকওয়া ও জ্ঞানের মাধ্যমে। যার দ্বীনি জ্ঞান যত গভীর, সে তত সহজে বিভ্রান্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। জ্ঞানহীন মানুষ যেকোনো আকর্ষণীয় কথায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, কারণ তার কাছে যাচাই করার কোনো মানদণ্ড নেই।

৮. দাওয়াত ও সংস্কারের ভিত্তি

ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব। কিন্তু জ্ঞান ছাড়া দাওয়াত হিতে বিপরীত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন —

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

"বলুন, এটাই আমার পথ — আমি জেনে-বুঝে (সুস্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে) আল্লাহর দিকে আহ্বান করি, আমি এবং আমার অনুসারীরা।"

[সূরা ইউসুফ – ১০৮]

এই আয়াতে 'বাসীরাহ' অর্থাৎ সুস্পষ্ট জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ দাওয়াতের কাজ করতে হবে জ্ঞানের ভিত্তিতে, আবেগের ভিত্তিতে নয়। একজন দাঈ যদি নিজে সঠিক জ্ঞান না রাখেন, তবে তিনি মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর পরিবর্তে বিভ্রান্ত

করে ফেলতে পারেন। তাই সমাজ সংস্কারের যেকোনো প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি হলো বিশুদ্ধ দ্বীনি ইলম।

পারিবারিক জীবনে দ্বীনি ইলমের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর হলো পরিবার। যদি পরিবার দ্বীনি জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত থাকে, তবে সেই পরিবারের সদস্যরা — সন্তান, স্ত্রী, ভাই-বোন কেউই দ্বীনের উপর অটল থাকতে পারবে না। দ্বীনী ইলম অর্জনের ফলে পরিবারের ভিত্তি যেমন দৃঢ় হবে, সমাজও তেমন কল্যাণময় হবে।

একটি সুস্থ ও কল্যাণময় পরিবার গঠনে দ্বীনি জ্ঞানের ভূমিকা অপরিসীম। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের হক, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা কেবল দ্বীনি ইলমের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। নিচে পারিবারিক জীবনে দ্বীনি ইলমের প্রয়োজনীয়তার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো।

(ক) পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষায়

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ প্রতিটি অভিভাবককে নির্দেশ করে বলেন —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।"

[সূরা আত-তাহরীম – ৬]

এই আয়াতে পরিবারকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া, নামায-ইবাদাতের অভ্যাস করানো এবং গুনাহ থেকে বাঁচানোর গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। একজন গৃহকর্তা যদি নিজে দ্বীনের জ্ঞান না রাখে, তবে সে তার স্ত্রী-সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা দিতে পারবে না।

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন —

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

[সহীহ বুখারী – ৮৯৩]

কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে — সে কি দ্বীনের আলো নিজের ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল, না অজ্ঞতায় তাদের ছেড়ে দিয়েছিল?

(খ) সন্তান প্রতিপালন ও তরবিয়াতে

সন্তানের ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন —

"কোনো পিতা তার সন্তানকে উত্তম আদব শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো উপহার দিতে পারে না।"

[সুনানে তিরমিযী – ১৯৫২]

পবিত্র কুরআনে লুকমান হাকিমের সন্তানকে দেওয়া উপদেশ একটি স্বতন্ত্র আদর্শ। তিনি প্রথমেই বলেছেন —

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"হে আমার প্রিয় সন্তান! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, নিশ্চয়ই শিরক বড় জুলুম।"

[সূরা লুকমান – ১৩]

একজন পিতা-মাতা নিজে দ্বীন না জানলে সন্তানকে কীভাবে শেখাবেন। তাওহীদ কি, শিরক কাকে বলে, কীভাবে অযু করতে হয়, কীভাবে সালাত পড়তে হয়, কীভাবে কুরআন শিখতে হয় — এসব নিজে না জানলে সন্তানকে শেখানো যায় না।

রাসূল (সা.) বলেছেন —

"তোমাদের সন্তানদের ৭ বছর বয়সেই সালাতের নির্দেশ দাও।"

[সুনানে আবু দাউদ – ৪৯৫]

সালাফে সালেহীনদের জীবনে সন্তানদের তরবিয়াতের অনুপ্রেরণাময় বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মা যখন তাকে রবী'আহ ইবনে আবী আবদির রহমান-এর কাছে পাঠাতেন, তখন বলতেন — "যাও, প্রথমে তার আদব শেখো, পরে তার ইলম শেখো।"

[তরতীবুল মাদারিক]

সন্তানদের জন্য কেবল কর্মশালাই যথেষ্ট নয়, ঘরে দ্বীনি জ্ঞানের পরিবেশ থাকতেই হবে।

সন্তানের সঠিক তরবিয়াত পিতামাতার উপর একটি গুরুদায়িত্ব, যার হিসাব কিয়ামতের দিন নেওয়া হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন —

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ۖ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ

"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে; পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল।"

[সহীহ বুখারী – ৮৯৩]

একজন পিতা বা মাতা যদি সন্তানকে দুনিয়াবি শিক্ষায় শিক্ষিত করে কিন্তু দ্বীনি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখে, তবে কিয়ামতের দিন এই দায়িত্ব অবহেলার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। তাই সন্তানকে দ্বীনি জ্ঞান দেওয়া পিতামাতার অন্যতম প্রধান কর্তব্য — যা তাদের নিজেদের দ্বীনি জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়।

(গ) স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্ব পালনে

স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের একে অপরের প্রতি বহু অধিকার রয়েছে। কোন অধিকার ফরয, কোনটি মুস্তাহাব, কীভাবে দাম্পত্য জীবন কাটাতে হবে — এসব দ্বীনি জ্ঞান ছাড়া জানা সম্ভব নয়। রাসূল (সা.) বলেছেন —

"তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের জন্য সর্বোত্তম, আর আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের সবার চেয়ে উত্তম।"

[সুনানে তিরমিযী – ৩৮৯৫]

দাম্পত্য কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পারিবারিক টানাপোড়েনের অধিকাংশ সময় দেখা যায় শরীয়তের দিকনির্দেশনা সম্পর্কে অজ্ঞতা। স্ত্রীর হক, স্বামীর হক, মহরের অধিকার, ভরণপোষণ — এসব কিছুর জ্ঞান না জানা থাকলে পরিবার সুখী হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে পারস্পরিক হকের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেন —

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"নারীদের উপর পুরুষদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি পুরুষদের উপরও নারীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে।"

[সূরা আল-বাকারা – ২২৮]

এই আয়াতে পারস্পরিক হকের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোন হক কীভাবে আদায় করতে হবে, তা জানার জন্য প্রয়োজন দ্বীনি জ্ঞান। যে দম্পতি একে অপরের শরয়ী অধিকার সম্পর্কে সচেতন, তাদের সংসারে শান্তি ও বরকত বিরাজ করে। তাই সুখী দাম্পত্য জীবনের মূল ভিত্তিও হলো দ্বীনি ইলম।

(ঘ) মীরাস ও পারিবারিক বিধান পালনে

ইসলামে মীরাস (উত্তরাধিকার) এক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা, যা অনেকেই অবহেলা করে। এর সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই অর্জন করতে চায় না। অথচ রাসূল (সা.) বলেছেন —

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ

"তোমরা মীরাসের জ্ঞান শেখো এবং অন্যদের শেখাও, কারণ তা ইলমের অর্ধেক; তা বিস্মৃত হয় এবং তাই আমার উম্মাহ থেকে সবার আগে উঠিয়ে নেওয়া হবে।"

[সুনানে ইবনে মাজাহ – ২৭১৯]

বর্তমান সময়ে বহু পরিবার মীরাসের সঠিক বণ্টন না জানার কারণে অন্যায়ভাবে কাউকে বঞ্চিত করে বা কাউকে অতিরিক্ত দেয়। এতে যে ভাই-বোনের সাথে দীর্ঘকালীন কলহ ও আল্লাহর গজব নেমে আসে — তা জ্ঞানহীন মানুষ বোঝেও না।

বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, দুগ্ধপান সংক্রান্ত শরীয়াহ বিধান — এসকল পারিবারিক বিধানের জন্যও দ্বীনি জ্ঞান অপরিহার্য।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে মীরাসের বিধান অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এর সীমা লঙ্ঘনকারীদের কঠোর শাস্তির কথা বলেছেন। তিনি বলেন —

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, যেখানে সে চিরকাল থাকবে; আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"

[সূরা আন-নিসা – ১৪]

এই আয়াতটি মীরাসের বিধান বর্ণনার পরপরই এসেছে, যা প্রমাণ করে মীরাসের সীমা লঙ্ঘন করা কত বড় গুনাহ। অথচ আজ সমাজে মীরাসের জ্ঞানের অভাবে এই গুনাহ ব্যাপকভাবে সংঘটিত হচ্ছে। তাই মীরাসের জ্ঞান অর্জন করা কেবল একটি একাডেমিক বিষয় নয়, বরং তা জাহান্নাম থেকে বাঁচার একটি উপায়।

(ঙ) পারিবারিক দ্বীনি পরিবেশ গঠন

ঘরে যদি কুরআন তিলাওয়াত, সালাত, দু'আ, ইসলামী আলোচনা, যিকর-এর পরিবেশ গড়ে ওঠে, তবে সন্তান-অনুভূতি সহজেই দ্বীনে অটল থাকে। রাসূল (সা.) বলেছেন —

مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

"সেই ঘর, যেখানে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং সেই ঘর যেখানে স্মরণ করা হয় না — এর উপমা জীবিত ও মৃতের মতো।"

[সহীহ মুসলিম – ৭৭৯]

সালাফদের ঘরে রাত হলে কুরআনের গুঞ্জন হতো, মৌমাছির আওয়াজের মতো। আর আজ আমাদের ঘরে গান-বাজনা, নাটক-সিনেমা দিয়ে ভরা। অথচ যদি প্রকৃত দ্বীনি ইলম থাকলে যেকোনো এই পরিবেশ কত সুন্দর করা যায়। সেই পরিবেশে রহমতের ফেরেশতাকে দূরে ঠেলে না দিয়ে ঘরে রহমত নিয়ে আসে — তা শুধু দ্বীনি ইলমের মাধ্যমেই সম্ভব।

সামাজিক জীবনে দ্বীনি ইলমের প্রয়োজনীয়তা

ব্যক্তি ও পরিবার মিলিতভাবে গঠন করে সমাজ। সমাজ যদি দ্বীনি জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়, তবে সেই সমাজে ন্যায়, ইনসাফ, ভ্রাতৃত্ব ও বরকত প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজ হয় সুন্দর। আর যদি সমাজ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে, তবে জুলুম, ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।

একটি আদর্শ সমাজ গঠনে দ্বীনি জ্ঞানের ভূমিকা ভিত্তিমূলক। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে — অর্থনীতি, বিচার, শিক্ষা, পারস্পরিক সম্পর্ক — সঠিক জ্ঞান ছাড়া কল্যাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ইসলাম একটি সামাজিক দ্বীন, যা ব্যক্তিকে কেবল নিজের কল্যাণে সীমাবদ্ধ না রেখে গোটা সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হতে উৎসাহিত করে। নিচে সামাজিক জীবনে দ্বীনি ইলমের প্রয়োজনীয়তার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো।

(ক) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

আল্লাহ তা'আলা বলেন —

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকাজে বাধা দেবে। আর তারাই সফলকাম।"

[সূরা আলে ইমরান – ১০৪]

এই আয়াতে আল্লাহ মানুষকে ভালো ও কল্যাণের দিকে ডাকা এবং অন্যায় ও পাপ কাজ করতে দেখলে তা থেকে বিরত রাখতে বলা হয়েছে। কিন্তু সৎকাজের আদেশ দেওয়ার জন্য কোনটি সৎকাজ আর কোনটি অসৎকাজ — তা জানা পূর্বশর্ত।

উমর ইবন আবদিল আজিজ (রহ.) বলতেন, "যে ইলম ছাড়া সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধের কাজ করে, সে যা সংশোধন করে তার চেয়ে বেশি বিকৃত করে।" আজ অনেক সংঘাত, ধর্মীয় বিভ্রান্তি, এমনকি ফেতনার পিছনের কারণ — আবেগ আছে কিন্তু ইলম নেই।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল দায়িত্ব। ভুল সময়ে, ভুল পদ্ধতিতে বা ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে এই দায়িত্ব পালন করলে কল্যাণের বদলে অকল্যাণ হতে পারে। তাই এই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনটি বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক — কোনটি সৎকাজ ও কোনটি অসৎকাজ তা জানা, কখন এই দায়িত্ব পালন করতে হবে তা জানা, এবং কীভাবে প্রজ্ঞার সাথে তা পালন করতে হবে তা জানা। এই তিনটি বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া সংস্কারের প্রচেষ্টা প্রায়ই বিপর্যয় ডেকে আনে।

(খ) ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইনসাফের উপর সদা প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হয়ে।"

[সূরা আন-নিসা – ১৩৫]

সমাজে বিচার, ফয়সালা, মীমাংসা — সব ক্ষেত্রেই শরীয়তের সঠিক জ্ঞান প্রয়োজন। কোনটি দলিল, কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, কোন শর্তে কারো বিরুদ্ধে রায় দেওয়া যায় — এসব ছাড়া বিচার করলে নিরপরাধ শাস্তি পায় আর অপরাধী ছাড়া পায়। রাসূল (সা.) বলেছেন —

"বিচারক তিন ধরনের — একজন জান্নাতি এবং দুইজন জাহান্নামী। যিনি জান্নাতি — তিনি সত্য চিনেছেন এবং সে অনুযায়ী রায় দিয়েছেন। দ্বিতীয়জন — যিনি সত্য চিনেও বিচ্যুত হয়েছেন। তৃতীয়জন — যিনি অজ্ঞতার ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন।"

[সুনানে আবু দাউদ – ৩৫৭৩]

এই হাদিস থেকেই বোঝা যায় তৃতীয়জন — যিনি অজ্ঞতার ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন এ কারণে তৃতীয়জন জাহান্নামী। তার কারণ অজ্ঞতা। সুতরাং এজন্যও ইলমের প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন এবং একে ঈমানের অন্যতম দাবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন —

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং আত্মীয়দের প্রতি দান করার আদেশ দেন।"

[সূরা আন-নাহল – ৯০]

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে জানতে হবে ন্যায় কী এবং অন্যায় কী। শরীয়তের বিধান, সাক্ষ্য-প্রমাণের নিয়ম, অপরাধের শাস্তি — এসব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ছাড়া ন্যায়বিচার সম্ভব নয়। তাই একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে হলে বিচারক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত — সবার মধ্যে দ্বীনি জ্ঞানের প্রসার অপরিহার্য।

(গ) হালাল-হারাম মেনে লেনদেন ও ব্যবসায়

সমাজে বরকত নাযিল হয় হালাল উপার্জনের মাধ্যমে। কোন কোন লেনদেন শুদ্ধ, কোনগুলো সুদ, কোনগুলো প্রতারণা — এসব না জানলে অজান্তেই ক্রয়-বিক্রয় হারামে লিপ্ত হয়। আজকের ব্যাংকিং, ক্রেডিট কার্ড, ইন্স্যুরেন্স, ফরেক্স, শেয়ার মার্কেট — সব ক্ষেত্রেই দ্বীনি জ্ঞানের অভাবে মুসলিমরা সন্দেহজনক ও হারাম লেনদেনে জড়িয়ে যাচ্ছেন। আমরা এই সমাজে বরকত আসবে কোথা থেকে।

আল্লাহ তা'আলা সুদকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন। কিন্তু এই পার্থক্য বোঝার জন্য জ্ঞান প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন —

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"

[সূরা আল-বাকারা – ২৭৫]

অনেকেই সুদ ও ব্যবসার পার্থক্য না বুঝে সুদি লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে এবং মনে করে এটিও তো ব্যবসারই মতো। অথচ আল্লাহ এই দুটির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য টেনেছেন। এই পার্থক্য জানার জন্য মু'আমালাত (লেনদেন) সম্পর্কিত ফিকহী জ্ঞান অপরিহার্য। তাই হালাল জীবিকা নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি ব্যবসায়ী ও কর্মজীবী মুসলিমের উচিত লেনদেন সংক্রান্ত দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা।

(ঘ) সমাজে দাওয়াতের কাজে

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন —

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"তুমি তোমার রবের পথে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।"

[সূরা আন-নাহল – ১২৫]

হিকমত মানেই হলো সঠিক বিষয়কে সঠিক সময়ে, সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা। এর জন্য চাই গভীর দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা। রাসূল (সা.) বলেছেন —

"যে হেদায়াতের দিকে আহ্বান করে, যারা তাকে অনুসরণ করে তাদের সমপরিমাণ সওয়াব সে পাবে।"

[সহীহ মুসলিম – ২৬৭৪]

কাউকে হেদায়াতের দাওয়াত দিতে হলেও নিজের সেই পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক।

জ্ঞান ছাড়া দাওয়াত অনেক সময় হিতে বিপরীত ফল বয়ে আনে। একজন অজ্ঞ দাঈ ভুল তথ্য ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে, যা সংশোধনের চেয়ে বেশি ক্ষতি করে। তাই দাওয়াতের ময়দানে নামার আগে প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি দাঈর কর্তব্য। সালাফগণ বলতেন — "যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়া আমল করে, সে যা সংশোধন করে তার চেয়ে বেশি নষ্ট করে।"

(ঙ) ফিতনা ও বিভ্রান্তি থেকে সমাজ রক্ষায়

শেষ জামানায় ফিতনা বৃদ্ধি পাবে। এই সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন —

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ

"আল্লাহ ইলমকে এমনিই উঠিয়ে নেবেন না, বরং আলেমদের উঠিয়ে নিয়ে ইলম তুলে নেবেন; এমনকি যখন কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবেন না, তখন মানুষ মূর্খদের নেতা বানাবে, তাদেরকে প্রশ্ন করা হলে তারা অজ্ঞতার ভিত্তিতে ফতুয়া দেবে — ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।"

[সহীহ বুখারী – ১০০]

এই হাদিসটি আজকের সমাজের আয়না। কেউ কেউ ইউটিউব ভিডিও দেখেই বিশেষজ্ঞ সাজে, ফতুয়া দেয়। এমনকি কুরআন-হাদিসেরও বিকৃত অর্থ ছড়াচ্ছে। সমাজের রক্ষাকবচ একটাই — গভীরভাবে দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন উলামা শ্রেণি, যারা মানুষকে সঠিক পথ দেখাবেন। রাসূল (সা.) বলেন —

"উলামাগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।"

[সুনানে আবু দাউদ – ৩৬৪১]

(চ) সামাজিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষায়

একটি সমাজের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব টিকে থাকে পারস্পরিক হক ও দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের উপর। কে কার প্রতিবেশী, প্রতিবেশীর হক কী, মুসলিম ভাইয়ের অধিকার কী — এসব জ্ঞান না থাকলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। রাসূল (সা.) বলেছেন —

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

"একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই; সে তার উপর জুলুম করে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয় না।"

[সহীহ বুখারী – ২৪৪২]

এই ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে দ্বীনি জ্ঞানের মাধ্যমে। যে সমাজে মানুষ একে অপরের হক সম্পর্কে সচেতন, সেই সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করে। অপরদিকে যে সমাজে এই জ্ঞান নেই, সেখানে হিংসা, বিদ্বেষ ও সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। তাই সামাজিক ঐক্য রক্ষায় দ্বীনি ইলমের ভূমিকা অপরিহার্য।

(ছ) কুসংস্কার ও বিদআত দূরীকরণে

সমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কার ও বিদআতের মূল কারণ হলো দ্বীনি জ্ঞানের অভাব। মানুষ যখন প্রকৃত দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তখন তারা বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণে নানা ভিত্তিহীন প্রথা ও বিদআতে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা এই অন্ধ অনুকরণের নিন্দা করে বলেন —

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

"যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অনুসরণ করো, তখন তারা বলে — বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে যে পথে পেয়েছি তা-ই অনুসরণ করব।"

[সূরা আল-বাকারা – ১৭০]

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, জ্ঞান ছাড়া অন্ধ অনুকরণ মানুষকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। একটি সমাজকে কুসংস্কার ও বিদআতমুক্ত করতে হলে সেখানে বিশুদ্ধ দ্বীনি জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। যখন মানুষ কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অর্জন

করবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা ভিত্তিহীন প্রথা ও বিদআত পরিত্যাগ করবে। তাই সমাজ সংস্কারের মূল হাতিয়ারও হলো দ্বীনি ইলম।

জাতীয় ও উম্মাহগত জীবনে দ্বীনি ইলমের প্রভাব

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ পেরিয়ে দ্বীনি ইলমের প্রভাব বিস্তৃত হয় সমগ্র উম্মাহর জীবনে। ইতিহাস সাক্ষী — সেদিন মুসলিম উম্মাহ ইলমকে আঁকড়ে ধরেছিল, সেদিন তারা পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে; আর যেদিন ইলম থেকে দূরে সরে গেছে, সেদিন তারা পিছনে পড়েছে।

ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্ম — সাহাবা, তাবিঈন-তাবে‘ এমন এক সভ্যতা গড়েছিলেন, যা জ্ঞান থেকে দ্বীন পর্যন্ত আলো ছড়িয়েছিল। এর মূল চাবিকাঠি ছিল দ্বীনি ইলম। সালমান আল-ফারসী (রা.) সম্পর্কে নবীজী বলেন —

“সালমান আমার পরিবার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত।”

তার মতো শত শত সাহাবী — যারা প্রথমে সাধারণ মানুষ ছিলেন, কিন্তু পরে দ্বীনি ইলম অর্জনের মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়েছেন।

তেমনি বর্তমান জাতীয় স্বার্থে যেমন দ্বীনি ইলম প্রয়োজন, তেমনি উম্মাহর ঐক্য ও এর জন্যও সঠিক জ্ঞান অর্জন এর কোনো বিকল্প নেই।

ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলিম মনীষীরা একই সাথে দ্বীনি ও দুনিয়াবি জ্ঞানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন — প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান ছিল অগ্রগণ্য। আর এই সবকিছুর মূলে ছিল কুরআনের সেই আহ্বান — ‘পড়ো’ এবং চিন্তা করো। যখন মুসলিমরা জ্ঞানচর্চায় শীর্ষে ছিল, তখন তারা ছিল বিশ্বসভ্যতার পথপ্রদর্শক।

আল্লাহ তা‘আলা একটি উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ উম্মাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এই শর্তে যে, তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে। তিনি বলেন —

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাহ, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে; তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ করো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো।”

[সূরা আলে ইমরান – ১১০]

এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পূর্বশর্ত হলো জ্ঞান। কারণ সৎ ও অসৎ কাজের পার্থক্য জানা এবং সঠিকভাবে দাওয়াত দেওয়া জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। তাই উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন দ্বীনি জ্ঞানের পুনর্জাগরণ। যখন উম্মাহ আবার জ্ঞানের পথে ফিরে আসবে, তখনই তারা পুনরায় বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।

৩য় অধ্যায়

৩.১ ইলম অর্জনের পদ্ধতি ও আদব

দ্বীনি ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে এক পবিত্র আমানত। যেমন প্রতিটি মহামূল্যবান বস্তুর গ্রহণ-প্রকৃতি ও আচরণবিধি থাকে, তেমনি ইলম অর্জনেরও কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও আদব রয়েছে।

সালাফে সালেহীন বলতেন, "আমরা ইলম শেখার আগে আদব শিখতাম।" ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন — "তাঁরা ইলম শেখার আগে তিন বছর আদব শিখেছেন।" এই অধ্যায়ে আমরা ইলম অর্জনের মূল পদ্ধতি ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট আদবসমূহ আলোচনা করব।

১. ইখলাস: ইলম অর্জনের প্রাণ

কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন — এটি প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ আদব। নিয়ত যদি দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্য — খ্যাতি, পদ, সম্পদ বা মানুষের প্রশংসা পাওয়া হয়, তবে সেই ইলম মালিকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং তা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। রাসূল (সা.) বলেছেন —

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"সকল কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।"

[সহীহ বুখারী – ১]

রাসূল (সা.) আরও বলেছেন —

"যে ব্যক্তি এমন ইলম শেখে — যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শেখা উচিত ছিল, কিন্তু সে কেবল দুনিয়ার সামান্য সম্পদের জন্য শেখে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুবাসও পাবে না।"

[সুনানে আবু দাউদ – ৩৬৬৪]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো — "ইলম অর্জনের নিয়ত কীভাবে শুদ্ধ করব?" তিনি বলেন, "নিয়ত কর — তুমি নিজের থেকে অজ্ঞতা দূর করছ, অন্যদের থেকেও দূর করছ।"

আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে আদেশ দিয়েছেন যে, সকল ইবাদত ও আমল কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করতে হবে। তিনি বলেন —

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

"তাদেরকে কেবল এই আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা নিষ্ঠার সাথে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।"

[সূরা আল-বাইয়িনাহ – ৫]

ইলম অর্জনও একটি ইবাদত, তাই এর ক্ষেত্রেও ইখলাস অপরিহার্য। যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞান অর্জন করে, তার এই প্রচেষ্টা ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় এবং সে প্রতি পদক্ষেপে সওয়াব লাভ করে। অপরদিকে যে দুনিয়াবি স্বার্থে জ্ঞান অর্জন করে, সে এই মহান ইবাদতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়।

২. শিক্ষকের প্রতি আদব ও সম্মান

ইলম এমন একটি নূর যা শিক্ষকের অন্তর থেকে শিক্ষার্থীর অন্তরে স্থানান্তরিত হয়। শিক্ষকের প্রতি যথাযথ সম্মান না থাকলে এই প্রবাহ থেমে যায়। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন —

"আমি ইমাম মালিক (রহ.)-এর সামনে অত্যন্ত সাবধানে পৃষ্ঠা উল্টাতাম — যাতে তিনি কাগজের আওয়াজও না শোনেন, তাঁর প্রতি ভয় ও সম্মানের কারণে।"

আলী ইবন আবী তালিব (রা.) বলতেন —

"যে আমাকে একটি অক্ষর শিখিয়েছে, আমি তার গোলাম হয়ে গেছি।"

শিক্ষকের কথার মাঝে বাধা না দেওয়া, প্রশ্ন করার সময় বিনয়ী থাকা, তাঁর সামনে উচ্চস্বরে না বলা, তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর সম্মান রক্ষা করা — এসব আদব ইলম অর্জনের মূল শর্ত।

শিক্ষকের সম্মান করা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানেরই সম্মান। রাসূল (সা.) জ্ঞানী ও মুরুব্বিদের সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন —

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

"সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না, বড়দের সম্মান করে না এবং আমাদের আলেমের হক চেনে না।"

[মুসনাদে আহমাদ – ২২৭৫৫]

এই হাদিসে রাসূল (সা.) আলেমের হক চেনা ও তাঁকে সম্মান করাকে ঈমানের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যে ব্যক্তি তার শিক্ষককে সম্মান করে না, সে জ্ঞানের প্রকৃত মূল্যও বোঝে না। তাই সালাফগণ শিক্ষকের সম্মানকে জ্ঞান অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করতেন এবং এ ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন।

৩. বিনয় ও নম্রতা

বিনয় ছাড়া ইলম অর্জিত হয় না। ইলম অর্জন করতে হলে বিনয়ীভাবেই করতে হবে। আবার লজ্জিত হওয়া যাবে না। আয়েশা (রা.) আনসারী নারীদের প্রশংসা করে বলেছেন —

"আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! লজ্জা তাঁদেরকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনে বাধা দেয়নি।"

[সহীহ মুসলিম – ৩৩২]

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় লজ্জা করে প্রশ্ন না করে ইলম থেকে দূরে থাকা যাবে না। আর বিপরীতে অহংকার — এটি ইলমের শত্রু। যে নিজেকে জ্ঞানী মনে করে, সে শেখার জন্য মুখাপেক্ষী হয় না। ইলম শেখার জন্য সর্বদা চিন্তাশীল অন্তর প্রয়োজন। মূসা (আ.)-এর মতো একজন মহান নবীও জ্ঞান অর্জনের জন্য খিযির (আ.)-এর কাছে বিনয়ের সাথে গিয়েছিলেন এবং শেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এই ঘটনা কুরআনে বর্ণনা করেছেন —

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

"মূসা তাকে বলল, আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি — যাতে আপনাকে যে জ্ঞান শেখানো হয়েছে তা থেকে আমাকে শেখাবেন?"

[সূরা আল-কাহফ – ৬৬]

লক্ষণীয় যে, মূসা (আ.) একজন উলুল আযম নবী হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞান অর্জনে কী অসাধারণ বিনয় প্রকাশ করেছেন। এ থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, জ্ঞান অর্জনে অহংকারের কোনো স্থান নেই। যত বড় জ্ঞানীই হোক না কেন, নতুন কিছু শেখার ক্ষেত্রে বিনয়ী হওয়া অপরিহার্য। অহংকার জ্ঞানের দরজা বন্ধ করে দেয়, আর বিনয় তা খুলে দেয়।

৪. ধৈর্য ও দীর্ঘ অধ্যবসায়

ইলম এক রাতের অর্জন নয় — এটি দীর্ঘ ধৈর্যের ফল। দেহকে আরামে রেখে ইলম অর্জন করা সম্ভব নয়। ধৈর্যের মাধ্যমে দিনের পর দিন চেষ্টা এবং ফিকিরের মাধ্যমেই ইলম অর্জন করা সম্ভব। এছাড়া ইলম অর্জনে আবেগও থাকতে হবে, কঠিন ত্যাগ ও সাধনার অধ্যবসায়। হাল ছেড়ে না দিয়ে বিভিন্ন সমস্যাকে দূরে রেখে ইলম অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তার শিক্ষক ওয়াকী‘ ইবনুল জাররাহ-এর কাছে স্মৃতির দুর্বলতার অভিযোগ করেছিলেন। শিক্ষক তাকে নসিহত করেছিলেন —

“গুনাহ ছেড়ে দাও, কারণ ইলম এবং ‘নূর’ মা আল্লাহ যে কোনো অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তবে যে অন্তরকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখতে হবে।”

আল্লাহ তা‘আলা ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের জন্য অশেষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। জ্ঞান অর্জনের পথে যে কষ্ট ও ধৈর্য রয়েছে, তা-ও এই পুরস্কারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন —

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের পুরস্কার বিনা হিসাবে পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে।”

[সূরা আয-যুমার – ১০]

ইলম অর্জনের পথ দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য। অনেক সময় একটি বিষয় বুঝতে দিনের পর দিন পরিশ্রম করতে হয়। এই পথে ধৈর্য হারালে চলবে না। পূর্ববর্তী আলেমগণ জ্ঞান অর্জনের জন্য দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও নানা কষ্ট সহ্য করেছেন, তবু হাল ছাড়েননি। তাঁদের এই ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের ফলেই তাঁরা ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন। তাই একজন প্রকৃত তালিবুল ইলমকে ধৈর্য ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের গুণে গুণান্বিত হতে হবে।

৫. লেখা ও সংরক্ষণ

ইলম অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো লিখে সংরক্ষণ করা। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) রাসূল (সা.) থেকে যা শুনতেন তাই লিখে রাখতেন। এজন্য তিনি বহু হাদীসের বর্ণনাকারী হয়েছিলেন।

হাসান আল-বসরী (রহ.) বলতেন —

“লেখার মাধ্যমে ইলমকে বেঁধে রাখো।”

সুতরাং বোঝা যায় আজকের যুগে এই নোট নেওয়া, রেকর্ডিং সংরক্ষণ, ডিজিটাল সংগ্রহ এবং এই লেখার সংস্করণ যা আধুনিক রূপ।

রাসূল (সা.) নিজেও জ্ঞান লিখে রাখার অনুমতি ও উৎসাহ দিয়েছেন। একবার এক সাহাবী অভিযোগ করলেন যে, তিনি যা শোনেন তা মনে রাখতে পারেন না। রাসূল (সা.) তাকে বললেন —

اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ

“তোমার ডান হাতের (অর্থাৎ লেখার) সাহায্য নাও।”

[সুনানে তিরমিযী – ২৬৬৬]

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট হয় যে, জ্ঞান লিখে সংরক্ষণ করা একটি নবী-অনুমোদিত পদ্ধতি। মানুষের স্মৃতি সীমিত ও দুর্বল, কিন্তু লিখিত জ্ঞান স্থায়ী হয় এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। ইসলামের সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডার — কুরআন, হাদিস, ফিকহ — আজ আমাদের হাতে পৌঁছেছে এই লিখন ও সংরক্ষণের মাধ্যমেই। তাই জ্ঞান লিখে রাখা ও সংরক্ষণ করা প্রতিটি তালিবুল ইলমের কর্তব্য।

৬. দু'আ

ইলম অর্জন করতে হলে প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নবী (সা.)-কে দু'আ শিখিয়েছেন —

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"আর বলুন — হে আমার রব! আমার ইলম বাড়িয়ে দিন।"

[সূরা ত্বহা – ১১৪]

ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতের তাফসিরে বলেন — "এই আয়াত প্রমাণ করে ইলম বৃদ্ধির চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, কারণ আল্লাহ নবীকে আর কিছু বৃদ্ধি কামনা করতে আদেশ দেননি।"

[তাফসীর ইবনে কাসির]

নবী (সা.) ফজরের সালাতের পর দু'আ করতেন —

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী ইলম, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।"

[সুনানে ইবনে মাজাহ – ৯২৫]

রাসূল (সা.) উপকারী জ্ঞান প্রার্থনার পাশাপাশি অনুপকারী জ্ঞান থেকেও আশ্রয় চাইতেন। তিনি দু'আ করতেন —

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা শিখিয়েছেন তা দিয়ে আমাকে উপকৃত করুন, আর আমাকে এমন জ্ঞান শেখান যা আমার উপকারে আসে, এবং আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।"

[সুনানে ইবনে মাজাহ – ৩৮৩৩]

এই দু'আগুলো থেকে বোঝা যায় যে, জ্ঞান অর্জনের প্রতিটি পর্যায়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা অপরিহার্য। কারণ জ্ঞান আল্লাহরই দান; তিনি যাকে চান, তাকে জ্ঞান দান করেন। তাই একজন তালিবুল ইলমের উচিত নিয়মিত এই দু'আগুলো পড়া এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে উপকারী জ্ঞান প্রার্থনা করা।

৭. অর্জিত জ্ঞানের উপর আমল

ইলম অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো — যা শেখা হয় তার উপর আমল করা। জ্ঞান যদি আমলে রূপান্তরিত না হয়, তবে তা কিয়ামতের দিন মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিদের তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন যারা জানে কিন্তু আমল করে না। তিনি বলেন —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেন বলো যা তোমরা করো না? তোমরা যা করো না তা বলা আল্লাহর কাছে অতিশয় ঘৃণার বিষয়।"

[সূরা আস-সাফ – ২-৩]

পূর্ববর্তী আলেমগণ এই আদবের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। বলা হয়, তাঁরা একটি আয়াত শিখলে সেই অনুযায়ী আমল না করা পর্যন্ত পরবর্তী আয়াত শিখতেন না। সুতরাং জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো নিজেকে সংশোধন করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা — কেবল তথ্য সংগ্রহ করা নয়।

৮. জ্ঞান বিতরণ ও গোপন না করা

অর্জিত জ্ঞান অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তা গোপন না করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। যে ব্যক্তি জ্ঞান গোপন করে, তার জন্য কঠিন সতর্কবার্তা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন —

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ ... أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

"নিশ্চয়ই যারা আমার নাযিলকৃত সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হিদায়াত গোপন করে... তাদের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারীগণও অভিসম্পাত করে।"

[সূরা আল-বাকারা – ১৫৯]

রাসূল (সা.) আরও কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন —

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

"যাকে কোনো ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো আর সে তা গোপন করল, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।"

[সুনানে আবু দাউদ – ৩৬৫৮]

তাই একজন প্রকৃত তালিবুল ইলমের দায়িত্ব হলো — নিজে যা শিখেছে তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। জ্ঞান বিতরণে কমে না, বরং বাড়ে। এটিই হলো সদকায়ে জারিয়ার সবচেয়ে উত্তম রূপ।

৯. সময়ের মূল্যায়ন ও ধারাবাহিকতা

ইলম অর্জনের একটি অপরিহার্য আদব হলো সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন। সময় এমন এক সম্পদ যা একবার হারিয়ে গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। পূর্ববর্তী আলেমগণ সময়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে জ্ঞান অর্জন ও আমলে ব্যয় করতেন। রাসূল (সা.) সময়ের মূল্য সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন —

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ۚ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

"দুটি নিয়ামত এমন আছে, যে দুটির ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় — সুস্থতা এবং অবসর সময়।"

[সহীহ বুখারী – ৬৪১২]

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, সুস্থতা ও অবসর সময় আল্লাহর দেওয়া অমূল্য নিয়ামত, যা অধিকাংশ মানুষ অবহেলায় নষ্ট করে। একজন প্রকৃত তালিবুল ইলম এই সময়কে জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করে। ধারাবাহিকতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ — কারণ অল্প অল্প করে নিয়মিত জ্ঞান অর্জন একসাথে অনেক পড়ার চেয়ে অধিক ফলদায়ক। রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো তা, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।

৩.২ বর্তমান যুগে ইলম অর্জনের উপায়

সালাফদের যুগে ইলম অর্জনের পদ্ধতি ছিল অকপট — মসজিদে শিক্ষকের সামনে বসে শোনা, মুখস্থ করা, প্রশ্ন করা। কিন্তু আমাদের যুগে প্রযুক্তি, ব্যস্ততা, কর্মসংস্থানের চাপ এবং সামাজিক জটিলতা নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি করেছে। তবে আল্লাহর রহমতে এই যুগেও ইলম অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়নি, বরং বহু নতুন মাধ্যম বের হয়েছে।

এখানে আমরা ক্রমান্বয়ে আলোচনা করব আজকের যুগে কীভাবে দ্বীনি ইলম অর্জন করা যায়।

১. মসজিদের দরসে অংশগ্রহণ

ইসলামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মসজিদ-ই-নববী। মসজিদ আজও দ্বীনি জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। নবীজি (সা.) বলেছেন —

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

"আল্লাহর গৃহসমূহের কোনো গৃহে যখনই কোনো দল কুরআন তিলাওয়াত করতে এবং পরস্পর তা পাঠ-অধ্যয়ন করতে একত্রিত হয়, তখনই তাদের উপর প্রশান্তি নামিল হয়, রহমত ঘিরে ধরে, ফেরেশতারা পরিবেষ্টন করে এবং আল্লাহ তাঁর কাছে যারা আছে তাদের কাছে তাদের কথা স্মরণ করেন।"

[সহীহ মুসলিম – ২৬৯৯]

আজও বহু মসজিদে ফজরের পর মক্তব, বাচ্চাদের জন্য তাফসীরের দরস, আসরের পর হাদিস এবং বয়স্কদের কুরআনের দরস, জুমু'আর পর ফিকহ আলোচনা হয়ে থাকে। এসব দরসে নিয়মিত একজন কর্মজীবী ব্যক্তির জন্যও সম্ভব। যেকোনো মানুষ চাইলেই এভাবে ইলম অর্জন করতে পারে।

২. মাদ্রাসা ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন

যারা পরিপূর্ণ ইলম অর্জনের জন্য নিজেকে তৈরি করতে চান, তাদের জন্য মাদ্রাসা শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। মাদ্রাসাতে ব্যবস্থাপনাগতভাবে — আকীদা, ফিকহ, উসুল, তাফসীর, হাদিস, মীরাস — সব শাখা পর্যায়ক্রমে শেখানো হয়।

সাহাবাদের যুগে অনেক বয়স হলেও দ্বীনি জ্ঞান অর্জনে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বাধা রয়েছে অনেক। মাদ্রাসাগুলোতে বয়স্কদের দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে খুব কম পরিসরে। কিন্তু বর্তমানে অনলাইন ভিত্তিক অনেক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে। দ্বীনি ইলম অর্জন তাই এখন সহজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার মতো প্রতিষ্ঠানগুলো আজ ঘরে বসে কর্মজীবী মানুষের জন্য দ্বীনি ইলম অর্জনের দরজা খুলে দিয়েছে। যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মাদ্রাসায় ভর্তি হতে পারেননি, তারাও এখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে আকীদা, ফিকহ, তাফসীর, হাদিস ইত্যাদি শাখায় জ্ঞান অর্জন করতে পারছেন। এটি আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত যে, তিনি প্রতিটি যুগে ইলম অর্জনের পথ সহজ করে রেখেছেন।

রাসূল (সা.) ইলম অর্জনের জন্য সফর করাকেও উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন —

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

"যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণে বের হয়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে নিয়োজিত থাকে।"

[সুনানে তিরমিযী – ২৬৪৭]

পূর্ববর্তী আলেমগণ একটি মাত্র হাদিস শেখার জন্য মাসের পর মাস সফর করতেন। আর আজ আমরা ঘরে বসেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছি। এই সুযোগকে কাজে লাগানো আমাদের কর্তব্য।

৩. আলেমদের লেকচার ও সহবত

প্রযুক্তি আজ এমন এক সুযোগ দিয়েছে যেখানে ঘরে বসে বিশ্বের সর্বোচ্চ মানের আলেমদের দরস শোনা যায়। ইউটিউব, পডকাস্ট, ইসলামিক অ্যাপ — এইগুলোর সঠিক ব্যবহার হতে পারে ইলম অর্জনের এক অমূল্য মাধ্যম।

তবে দুটি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে —

(ক) এমন আলেম নির্বাচন করতে হবে যাদের আকিদা ও মানহাজ সালাফদের অনুসরণ করে।

(খ) কেবল শোনার সাথে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না — নোট নিতে হবে এবং প্রয়োগ করতে হবে।

মালেক ইবনে দীনার (রহ.) বলতেন —

"যে ইলম অর্জন করে আমলের উদ্দেশ্যে, তার ইলম তাকে বিনয়ী করে; আর যে আমল ছাড়া ইলম অর্জন করে তার ইলম তার অহংকার বাড়ায়।"

আলেমদের সহবত ও সৎসঙ্গ ইলম অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা সৎলোকদের সাথে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।"

[সূরা আত-তাওবা – ১১৯]

আলেম ও সৎলোকদের সংস্পর্শে থাকলে তাঁদের জ্ঞান, আচরণ ও তাকওয়া থেকে শেখা যায়। বইয়ে যা পাওয়া যায় না, তা প্রায়ই একজন আলেমের সাহচর্যে শেখা যায় — কীভাবে জ্ঞানকে জীবনে প্রয়োগ করতে হয়, কীভাবে বিনয় ও আদব রক্ষা করতে হয়। তাই কেবল অনলাইন লেকচারেই সীমাবদ্ধ না থেকে সম্ভব হলে সরাসরি আলেমদের সহবত গ্রহণ করা উত্তম।

৪. অথেনটিক বইসমূহ অধ্যয়ন ও আলেমের সহবত

আজকের যুগে দ্বীন অধ্যয়নে রয়েছে অমূল্য মূল্যবান কিতাব। তাফসীর পড়তে চাইলে তাফসীর ইবনে কাসির, খুবই প্রসিদ্ধ কিতাব। রিয়াদুস সালেহীন, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, ফিকহ সংক্রান্ত অনেক কিতাব রয়েছে। শুরুতে বাংলা অনূদিত কিতাব দিয়ে

শুরু করে সামনে আগানো যায়। পরে আরবি শেখার চেষ্টা করতে হবে। কারণ আরবি ছাড়া দ্বীনি ইলমের গভীরে যাওয়া যায় না।

দৈনন্দিন জীবনে ছোট ছোট শিক্ষা একসময় বড় কিছু অর্জনের পথ হয়। আলেমদের সহবতে থাকা এক অমূল্য মাধ্যম অর্জন করতে সাহায্য করে। আলেমদের চলনে আচরণে প্রত্যহ তাদের আচার-আচরণ থেকে শিক্ষা অর্জন এবং জ্ঞান অর্জন দুটোই সহজ হয়। এছাড়া দৈনন্দিন জীবনে দ্বীনদার বন্ধুদের সঙ্গে থাকা ইলম বৃদ্ধির উপায়। রাসূল (সা.) বলেছেন —

"মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকে, সুতরাং প্রত্যেকে যেন ভেবে দেখে — সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে।"

[সুনানে আবু দাউদ – ৪৮৩৩]

আলেম ও সৎসঙ্গীর সহবত মানুষের জ্ঞান ও চরিত্র উভয়কেই পরিশীলিত করে। রাসূল (সা.) সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গীর একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন —

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ

"সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গীর উপমা হলো আতর-বিক্রেতা ও কামারের হাপরের মতো।"

[সহীহ বুখারী – ৫৫৩৪]

আতর-বিক্রেতার সঙ্গে থাকলে হয় আতর পাওয়া যায়, নয়তো তার সুঘ্রাণ পাওয়া যায়; আর কামারের হাপরের কাছে থাকলে হয় কাপড় পুড়ে যায়, নয়তো দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। তেমনি একজন আলেম বা দ্বীনদার ব্যক্তির সহবতে থাকলে তার জ্ঞান ও উত্তম চরিত্রের প্রভাব আমাদের উপর পড়ে। তাই জ্ঞান অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো আলেম ও সৎ মানুষদের সাহচর্য গ্রহণ করা।

৫. ডিজিটাল মাধ্যমের সতর্ক ব্যবহার

ইন্টারনেট দ্বীনি ইলমের জন্য যেমন আশীর্বাদ, তেমন ফেতনারও আখড়া। আজকাল ইউটিউবে নাম-পরিচয়হীন বহু ব্যক্তি তাফসীরের বিকৃত ব্যাখ্যা, যঈফ হাদীস এমনকি বিদআত প্রচার করছে। যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই পথভ্রষ্ট হচ্ছে।

সাধারণ মুসলিমদের জন্য মূলনীতি — যে নিজেকে আলেম দাবি করে তার পরিচয় ও সনদ যাচাই করা। যাদেরকে স্বীকৃত উলামা প্রশংসা করেছেন, তাদের অনুসরণ করা। রাসূল (সা.) আগেই বলেছেন —

"শেষ জামানায় এমন কিছু মিথ্যুক আলেম আসবে, যারা তোমাদের কাছে এমন হাদীস বর্ণনা করবে — যা না তোমরা, না তোমাদের বাপ-দাদা শুনেছে। সুতরাং সাবধান হও, এবং তাদের থেকেও সাবধান থাকো।"

[সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দিমা – ৭]

আল্লাহ তা'আলা যাচাই-বাছাই ছাড়া কোনো তথ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা যাচাই করে নাও।"

[সূরা আল-হুজুরাত – ৬]

এই আয়াত ডিজিটাল যুগে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো ধর্মীয় তথ্য পাওয়ামাত্রই তা গ্রহণ বা প্রচার করা ঠিক নয় — বরং তা নির্ভরযোগ্য আলেম ও সূত্রের মাধ্যমে যাচাই করা জরুরি। অন্যথায় অজান্তেই ভ্রান্ত তথ্য ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তাই ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারে সতর্কতা ও যাচাই-বাছাই একটি অপরিহার্য দ্বীনি দায়িত্ব।

৬. নিয়মিত অধ্যয়ন ও জ্ঞানের মজলিস

ইলম অর্জন একদিনের কাজ নয়, বরং এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। অল্প অল্প করে নিয়মিত অধ্যয়ন করা একসাথে অনেক পড়ার চেয়ে উত্তম। পূর্ববর্তী আলেমগণ প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করতেন। আজকের ব্যস্ত জীবনেও যদি কেউ প্রতিদিন অল্প সময় দ্বীনি জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করে, তবে বছর শেষে তা বিশাল সম্পদে পরিণত হয়।

জ্ঞানের মজলিসে উপস্থিত থাকা একটি বরকতপূর্ণ আমল। যেখানে আল্লাহর জিকির ও দ্বীনি আলোচনা হয়, সেই মজলিসকে রাসূল (সা.) জান্নাতের বাগানের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন —

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا ۚ قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ

"যখন তোমরা জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে যাবে, তখন তাতে চরে নাও। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন — জান্নাতের বাগান কী? তিনি বললেন — জিকিরের মজলিস (জ্ঞানের আসর)।"

[সুনানে তিরমিযী – ৩৫১০]

সুতরাং দ্বীনি জ্ঞানের আসরে নিয়মিত উপস্থিত থাকা কেবল জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং তা জান্নাতের বাগানে বিচরণের সমতুল্য একটি ইবাদত।

৭. ইলম অর্জনের পথে বাধা ও তা অতিক্রমের উপায়

ইলম অর্জনের পথে নানা বাধা আসে — অলসতা, সময়ের অভাব, পার্থিব ব্যস্ততা, এবং সবচেয়ে বড় বাধা শয়তানের কুমন্ত্রণা। শয়তান মানুষকে জ্ঞান অর্জন থেকে বিরত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে, কারণ সে জানে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। তাই এই বাধাগুলো অতিক্রম করতে হলে দৃঢ় সংকল্প ও আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন।

পার্থিব ব্যস্ততা ইলম অর্জনের পথে অন্যতম বড় বাধা। কিন্তু পূর্ববর্তী আলেমগণ জীবিকা অর্জনের পাশাপাশিও জ্ঞানচর্চা চালিয়ে গেছেন। অনেক বড় মুহাদ্দিস পেশায় ব্যবসায়ী বা কারিগর ছিলেন, তবু তাঁরা ইলমের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তাই ব্যস্ততা কখনও জ্ঞান অর্জন না করার অজুহাত হতে পারে না।

আরেকটি বড় বাধা হলো গুনাহ। গুনাহ অন্তরকে কঠিন করে দেয় এবং জ্ঞানের নূরকে নিভিয়ে দেয়। তাই ইলম অর্জনের পথে অগ্রসর হতে হলে গুনাহ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। এর সাথে প্রয়োজন নিয়মিত দু'আ, কারণ ইলম আল্লাহরই দান। যে আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে জ্ঞান প্রার্থনা করে এবং সেই পথে চেষ্টা চালিয়ে যায়, আল্লাহ তার জন্য জ্ঞানের পথ সহজ করে দেন।

৩.৩ ইলমহীনতার ক্ষতি ও পরিণাম

ইলম যেমন এক মহাসম্পদ, ইলমহীনতা তেমনি এক অভাব ও দারিদ্র। আল্লাহ তা'আলা মানুষের সবচেয়ে নিম্নতম স্তরের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে —

إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

"তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো — বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট।"

[সূরা আল-আরাফ – ১৭৯]

এই আয়াতের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন — তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে বোঝে না, চোখ আছে কিন্তু দেখে না, কান আছে কিন্তু শোনে না। অর্থাৎ ইলমহীনতা মানুষকে পশুর সমকক্ষ, এমনকি এর চেয়েও নিম্নে নামিয়ে দেয়।

মানুষ ও পশুর মধ্যে মূল পার্থক্য হলো জ্ঞান ও বিবেক। যে মানুষ এই জ্ঞানের নিয়ামতকে কাজে লাগায় না, সে প্রকৃতপক্ষে তার মানবিক মর্যাদা থেকে নিচে নেমে যায়। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামবাসীদের আক্ষেপ বর্ণনা করে বলেন যে, তারা স্বীকার করবে — যদি তারা জ্ঞান ও বিবেক কাজে লাগাত, তবে আজ এই পরিণতি হতো না। আল্লাহ বলেন —

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

"তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।"

[সূরা আল-মুলক – ১০]

এই আয়াত স্পষ্ট করে যে, জ্ঞান ও বিবেকের সঠিক ব্যবহার না করা জাহান্নামে প্রবেশের অন্যতম কারণ। ইলমহীনতা তাই কেবল দুনিয়ার ক্ষতি নয়, বরং আখিরাতেও চিরস্থায়ী ধ্বংসের কারণ হতে পারে। এ থেকে বোঝা যায়, জ্ঞান অর্জন মানুষের মুক্তির পথ এবং অজ্ঞতা ধ্বংসের পথ।

১. ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভ্রান্তি ও বাতিল আমল

অজ্ঞতা সবচেয়ে আগে ব্যক্তির নিজের ইবাদতকে বিনষ্ট করে। ইবন আল-কাইয়ুম (রহ.) বলেন, "অজ্ঞতা সকল রোগের মূল, আর তার চিকিৎসা ইলম।" ব্যক্তি না জেনেই অনেক আমল করে আসে। কিন্তু আমল ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, লজ্জায় তা কাউকে প্রশ্নও করে না। এতে যে সারাজীবন অজ্ঞতায় থেকে যায়।

আমাদের আজকের সমাজে বহু মানুষ ভুল অযু, ভুল গোসল, ভুল সালাত নিয়ে যুগের পর যুগ কাটিয়ে দিচ্ছে। তারা জানারও চেষ্টা করে না তাদের আমল-ইবাদত ঠিক আছে কিনা।

২. আকীদাগত বিভ্রান্তি ও অজ্ঞাতে শিরক

ইলমহীনতার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পরিণাম হলো — মানুষ অজ্ঞাতেই শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়। রাসূল (সা.) বলেছিলেন —

"আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ভয় করি ছোট শিরক নিয়ে। সাহাবীরা বললেন — হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কী? তিনি বললেন — রিয়া (লোক-দেখানো ইবাদত)।"

[মুসনাদে আহমাদ – ২৩৬৩০]

আজকের সমাজে কবরের পাশে মান্নত করা, পীর-ফকিরের কাছে সাহায্য চাওয়া, মৃত ব্যক্তিকে আহ্বান করা, তাবিজে অন্ধবিশ্বাস — এই বড় বড় শিরক অনেক বেশি। এসব হয় কেবল বিশুদ্ধ তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে।

শিরক এমন এক গুনাহ যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না, যদি তা থেকে তাওবা না করা হয়। এর ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন —

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না; এ ছাড়া অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।"

[সূরা আন-নিসা – ৪৮]

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, শিরক কত বড় অপরাধ। অথচ আজ অনেক মুসলিম অজ্ঞতার কারণে নানা ধরনের শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ছে — অথচ তারা বুঝতেও পারছে না। এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো বিশুদ্ধ তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা। যে ব্যক্তি তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে, সে কখনও শিরকের ফাঁদে পা দেয় না।

৩. পারিবারিক ও সামাজিক পতন

যে ঘরে দ্বীনি জ্ঞান নেই, সেই ঘরে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার আদায় হয় না, সন্তান বেপরোয়া হয়, পরিবার ভেঙে যায়। আজকে ক্রমবর্ধমান তালাকের হার, পারিবারিক কলহ, কিশোর অপরাধ — এসকল কিছুর পেছনের মূল কারণ দ্বীনি অজ্ঞতা।

সমাজে মদ, জুলুম, সুদের চক্র, ঘুষ, প্রতারণা — সব কিছুই ইলম না থাকার ফল। যদি প্রকৃত দ্বীনি জ্ঞান আজকের পরিবার ও সমাজে প্রচার, প্রসার-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন সকলেই দেখবে। আর শুরুটা হতে হবে পারিবারিক দ্বীনি ইলম অর্জনের মধ্য দিয়ে।

একটি সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের মূলে থাকে জ্ঞানের অভাব। যখন মানুষ জানে না কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম, কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায় — তখন সে সহজেই পাপাচারে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের সীমালঙ্ঘন ও অজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যে জাতি জ্ঞান থেকে দূরে সরে গেছে, তারা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গেছে।

তাই সমাজ সংস্কারের প্রকৃত পথ হলো জ্ঞানের প্রসার। আইন দিয়ে, শাস্তি দিয়ে সাময়িকভাবে অপরাধ দমন করা গেলেও, স্থায়ী পরিবর্তন আসে কেবল জ্ঞান ও সচেতনতার মাধ্যমে। যখন প্রতিটি ব্যক্তি দ্বীনি জ্ঞানে আলোকিত হবে, তখন সমাজ থেকে অন্যায় ও অবিচার আপনা-আপনিই দূর হয়ে যাবে।

৪. কিয়ামতের দিন জবাবদিহি

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন —

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তা অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ, অন্তর — এসবের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

[সূরা আল-ইসরা – ৩৬]

আজ যা না জেনে বলা হচ্ছে, করা হচ্ছে, প্রচার করা হচ্ছে — এর প্রতিটি কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে। "আমি জানতাম না" এই অজুহাত সেদিন গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ জানার সুযোগ ছিল কিন্তু যে গ্রহণ করেনি। সুতরাং দুনিয়ার জীবনে সঠিক দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের ফিকির সবসময় চালিয়ে যাওয়া। যেন এই জবাবদিহিতার হাত থেকে রাচা যায়। বলতে যেন পারব আমিতো ফিকির করেছি।

কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষকে তার জ্ঞান ও আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন —

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ

"কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার পা নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে তার জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় — সে তা দিয়ে কী আমল করেছে।"

[সুনানে তিরমিযী – ২৪১৭]

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট হয় যে, জ্ঞান অর্জন না করার জন্য যেমন জবাবদিহি করতে হবে, তেমনি অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল না করার জন্যও জবাবদিহি করতে হবে। তাই দুনিয়ার জীবনে আমাদের কর্তব্য হলো জ্ঞান অর্জন করা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা — যাতে কিয়ামতের দিন আমরা এই কঠিন প্রশ্নের সামনে লজ্জিত না হই।

৫. ইলম উঠে যাওয়া কিয়ামতের আলামত

দ্বীনি ইলমের অনুপস্থিতি কেবল ব্যক্তিগত বা সামাজিক ক্ষতি নয়, বরং এটি কিয়ামতের একটি বড় আলামত। ইলম উঠে যাওয়া এবং অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়া শেষ জামানার লক্ষণ। রাসূল (সা.) বলেছেন —

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ

“কিয়ামতের অন্যতম আলামত হলো — ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং অজ্ঞতা স্থির হয়ে যাবে।”

[সহীহ বুখারী – ৮০]

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট হয় যে, যখন কোনো সমাজে দ্বীনি জ্ঞানের চর্চা কমে যায় এবং অজ্ঞতা প্রসার লাভ করে, তখন বুঝতে হবে সেই সমাজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই ইলমের চর্চা টিকিয়ে রাখা একটি সমাজের টিকে থাকার পূর্বশর্ত।

৬. অজ্ঞতা ইবাদতকে বিনষ্ট করে

অজ্ঞতার আরেকটি ভয়ঙ্কর ক্ষতি হলো — এটি নিষ্ঠাবান মানুষের ইবাদতকেও বিনষ্ট করে দিতে পারে। একজন মানুষ হয়তো আন্তরিকভাবে ইবাদত করছে, কিন্তু জ্ঞানের অভাবে তার পদ্ধতি ভুল হলে সেই ইবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না। রাসূল (সা.) এমন এক ব্যক্তির কথা বলেছেন যে ভুলভাবে সালাত আদায় করছিল, এবং নবীজি তাকে বললেন —

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

“ফিরে যাও এবং পুনরায় সালাত আদায় করো, কারণ তুমি (সঠিকভাবে) সালাত আদায় করোনি।”

[সহীহ বুখারী – ৭৫৭]

লক্ষণীয় যে, লোকটি আন্তরিকভাবেই সালাত আদায় করছিল, কিন্তু সঠিক জ্ঞানের অভাবে তার সালাত শুদ্ধ হয়নি। এ থেকে বোঝা যায়, কেবল আন্তরিকতা যথেষ্ট নয় — ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য সঠিক জ্ঞান অপরিহার্য। অজ্ঞতা একজন মানুষের সারাজীবনের ইবাদতকেও মূল্যহীন করে দিতে পারে।

৭. অজ্ঞতা থেকে চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ি

দ্বীনি জ্ঞানের অভাব অনেক সময় ধর্মের নামে চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ির জন্ম দেয়। যারা দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে না, তারা প্রায়ই হয় দ্বীনের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করে, নয়তো অতিরিক্ত কঠোরতায় লিপ্ত হয়। অথচ ইসলাম মধ্যপন্থার দ্বীন। আল্লাহ তা‘আলা এই উম্মাহকে মধ্যপন্থী উম্মাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন —

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

“এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী উম্মাহ বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হও।”

[সূরা আল-বাকারা – ১৪৩]

রাসূল (সা.) দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন —

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ

"তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকো, কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি।"

[সুনানে ইবনে মাজাহ – ৩০২৯]

এই চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ির মূল কারণ হলো সঠিক জ্ঞানের অভাব। গভীর ও ভারসাম্যপূর্ণ দ্বীনি জ্ঞান একজন মানুষকে মধ্যপন্থায় প্রতিষ্ঠিত রাখে — যেখানে না থাকে শিথিলতা, না থাকে অতিরিক্ত কঠোরতা। তাই চরমপন্থা থেকে উম্মাহকে রক্ষা করতে হলেও বিশুদ্ধ দ্বীনি ইলমের বিকল্প নেই।

৪র্থ অধ্যায়

৪.১ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য ইলমের গুরুত্ব

ইসলামের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য — দ্বীনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই। উভয়ের উপরই ইলম অর্জন ফরয। দু'জনকেই জ্ঞান অর্জন করতে বলা হয়েছে।

ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সকল বিধান। এছাড়া ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদের অন্তরে দ্বীনের জ্ঞানের বীজ বপন করা। এটি ইসলামের অনন্য শিক্ষা।

১. ইলম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ফরয দায়িত্ব

রাসূল (সা.)-এর বিখ্যাত হাদীস —

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"ইলম অর্জন প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।"

[সুনানে ইবনে মাজাহ – ২২৪]

এখানে 'মুসলিম' শব্দটি পুরুষ-নারী উভয়কেই শামিল করে। অতএব জ্ঞান অর্জন উভয়ের জন্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ বলেন —

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ... وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীরা এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীরা — আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।"

[সূরা আল-আহযাব – ৩৩:৩৫]

এই আয়াতে দশটি গুণের ক্ষেত্রে আল্লাহ নারী ও পুরুষকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। যাতে স্পষ্ট হয় ইসলামের প্রতিটি কল্যাণ পুরুষের জন্য যেমন, নারীর জন্যও তেমন।

২. ইসলামী ইতিহাসে আলেমা মহিলারা

ইসলামের ইতিহাসে নারীদের ইলমে অবদান এক উজ্জ্বল অধ্যায়। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) ছিলেন এমন একজন ফকীহা আলেমা, যাঁর কাছে বড় বড় সাহাবী পর্যন্ত প্রশ্ন করতে আসতেন। আবু মূসা আশ'আরী (রা.) বলতেন —

"আমরা সাহাবীগণ যখনই কোনো হাদীসের ব্যাপারে সংশয়ে পড়েছি এবং আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেছি, সর্বদা তাঁর কাছে সে বিষয়ে ইলম পেয়েছি।"

[সুনানে তিরমিযী – ৩৮৮৩]

আয়েশা (রা.) ২২১০টির অধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে ইলম শেখার সংখ্যা শত শত। হাফসা (রা.), উম্মে সালামা, মায়মুনা সকল উম্মুল মুমিনীনই ছিলেন আলেমা।

সাহাবীয়াদের মধ্যে আসমা বিনতে আবু বকর (রা.), উম্মে সুলাইম (রা.), উম্মে আতিয়্যা (রা.) — এমন বহু নারী আছেন যারা হাদিস বর্ণনা করেছেন, ফিকহী মাসআলায় সমাধান দিয়েছেন।

উম্মু দারদা আস-সুগরা (রহ.) দামেস্কের মসজিদে পুরুষ-নারী উভয়কেই ফিকহ শেখাতেন। ইতিহাসে এমন আলেমার সংখ্যা শত শত। সুতরাং আমাদের বলার কোনো সুযোগ নেই যে, ইসলাম নারী শিক্ষা সমর্থন করে না। নারীদের ইলম অর্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা ইসলাম দিয়েছে।

সাহাবী নারীরা জ্ঞান অর্জনে এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে, তাঁরা রাসূল (সা.)-এর কাছে আলাদা একটি দিন নির্ধারণের অনুরোধ করেছিলেন যাতে তিনি তাঁদের দ্বীনি শিক্ষা দিতে পারেন। একটি হাদিসে এসেছে যে, নারীরা রাসূল (সা.)-কে বললেন —

غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ

"পুরুষরা আপনার কাছে আসার ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে; তাই আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একটি দিন নির্ধারণ করুন।"

[সহীহ বুখারী – ১০১]

রাসূল (সা.) তাঁদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করলেন এবং সেদিন তাঁদের দ্বীনি শিক্ষা দিতেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, নারীদের জ্ঞান অর্জন ইসলামে কেবল অনুমোদিতই নয়, বরং উৎসাহিত। সাহাবী নারীদের এই জ্ঞানস্পৃহা আজকের মুসলিম নারীদের জন্য এক উজ্জ্বল আদর্শ।

৩. শিশু বয়স থেকেই শিক্ষা — শিশুদের তরবিয়াত

সালাফদের শিশুদের শিক্ষাদান-পদ্ধতি — একটি শিশু এমন এক পবিত্র খাতার মতো, যেখানে যা লেখা হয় তাই স্থায়ী হয়। নবীজি (সা.) বলেছেন —

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"প্রতিটি শিশু ফিতরাতের (ইসলামের স্বভাবজাত প্রকৃতির) উপর জন্মগ্রহণ করে, তারপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়।"

[সহীহ বুখারী – ১৩৫৮]

এই হাদিস প্রমাণ করে — শিশু একটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ প্রকৃতি নিয়ে জন্মায়, কিন্তু তাকে কোন পরিবেশে গড়ে তোলা হয় — এর উপর তার আকীদা ও আচরণ নির্ভর করে। তাই শৈশব থেকেই দ্বীনি শিক্ষা শুরু করা অপরিহার্য।

আমাদের সন্তানকে ছোট থেকেই তাওহীদ, সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, নবীজি (সা.)-এর জীবনচরিত শেখাতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন —

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সেই সালাতের নির্দেশ দাও, এবং দশ বছর বয়সে (অমান্য করলে) সংশোধনমূলক প্রহার করো।"

[সুনানে আবু দাউদ – ৪৯৫]

ইমাম যাহাবী (রহ.) বর্ণনা করেছেন — ইমাম মালিক (রহ.)-এর মা শৈশব বয়সেই তাঁকে শিক্ষকের কাছে পাঠাতেন এবং বলতেন, "বেটা! যাও — আগে শিক্ষক এর আদব ও স্বভাব নাও, তারপর তাঁর ইলম শেখো।"

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) সাত বছর বয়সেই কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। দশ বছর বয়সে মুয়াত্তা ইমাম মালিক মুখস্থ করেছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) দশ বছরের কম বয়সে হাদীস শোনা শুরু করেছিলেন এবং ষোল বছর বয়সে গুরুত্বপূর্ণ হাদিসগুলো মুখস্থ করে ফেলেন।

আর আমাদের সন্তানদের শৈশব শুরু হয় নাচ, গান, কবিতা ট্রেনিং দিয়ে — যা তাদের ভবিষ্যৎকে মারাত্মক প্রভাবিত করে। তাই প্রত্যেক মা-বাবার উচিত শৈশব থেকেই দ্বীনের ভিত তার অন্তরে গেথে দেওয়া এবং দ্বীনি ভিত্তিকে দৃঢ় রেখে যুগোপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞান সংযোজন করা।

৪. দ্বীনি ও দুনিয়াবি শিক্ষার ভারসাম্য

সন্তানের তরবিয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো দ্বীনি ও দুনিয়াবি শিক্ষার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। ইসলাম কখনও দুনিয়াবি জ্ঞান অর্জনকে নিষেধ করেনি, বরং উৎসাহিত করেছে। তবে শর্ত হলো — দ্বীনি জ্ঞানকে ভিত্তি হিসেবে রেখে দুনিয়াবি জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যে সন্তান দ্বীনি জ্ঞানে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে চিকিৎসক, প্রকৌশলী বা বিজ্ঞানী হয়, সে তার দুনিয়াবি দক্ষতাকেও উম্মাহর কল্যাণে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করতে পারে।

ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষীরা একই সাথে দ্বীনি ও দুনিয়াবি জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তাঁদের দ্বীনি ভিত্তি শক্ত ছিল বলেই তাঁরা তাঁদের জ্ঞানকে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার

করতে পেরেছেন। আজকের অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের এমনভাবে গড়ে তোলা যেন তারা উভয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয় এবং দ্বীনকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখে।

৫. পরিবারে দ্বীনি জ্ঞানচর্চার পরিবেশ

সন্তানের তরবিয়াতের সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো ঘরে দ্বীনি জ্ঞানচর্চার পরিবেশ তৈরি করা। শিশু যা দেখে তাই শেখে। যদি ঘরে কুরআন তিলাওয়াত, দ্বীনি আলোচনা ও নিয়মিত সালাতের পরিবেশ থাকে, তবে সন্তান স্বাভাবিকভাবেই দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। রাসূল (সা.) বলেছেন —

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ

"তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও।"

[সুনানে আবু দাউদ – ৪৯৫]

এই নির্দেশ থেকে বোঝা যায় যে, ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের দ্বীনি অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আর এই অভ্যাস গড়ে তোলার দায়িত্ব মূলত পরিবারের। তাই একটি দ্বীনি পরিবেশসম্পন্ন পরিবারই পারে একটি দ্বীনদার প্রজন্ম উপহার দিতে।

৪.২ ইলম ও আমলের সম্পর্ক

ইলম এবং আমল — এই দুটি ইসলামের সমপর্যায়ের ভাই। একটি ছাড়া অপরটি অসম্পূর্ণ। ইলম হলো বৃক্ষ এবং আমল হলো তার ফল। ফল ছাড়া বৃক্ষ যেমন উপকারহীন, আমল ছাড়া ইলমও তেমনি অর্থহীন। এই অর্থে এখন আমরা এই দুটির পরস্পরের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করব।

১. ইলম আমলের পূর্বশর্ত

কোনো আমল সহীহ হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম শর্ত সেই আমল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন —

"যে আমল ইলম ছাড়া করা হয়, তা কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশি বহন করে।"

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন — "ইলম কথা ও কাজের পূর্বে" — এই শিরোনামে। আল্লাহ যে আগে জ্ঞান, তারপর আমলের নির্দেশ দিয়েছেন, তা সূরা মুহাম্মাদের আয়াত দিয়ে প্রমাণ করেছেন। আল্লাহ বলেন —

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

"জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; অতঃপর তোমার গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।"

[সূরা মুহাম্মাদ – ১৯]

এই আয়াতে আল্লাহ প্রথমে 'জেনে রাখো' (ইলম) বলেছেন, তারপর 'ক্ষমা প্রার্থনা করো' (আমল) বলেছেন। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, শরীয়তে জ্ঞান আমলের পূর্বে স্থান পায়।

২. ইলম যদি আমলে রূপান্তরিত না হয়

ইলম যদি আমলে রূপান্তরিত না হয়, কেবল মুখস্থ তথ্য, কেবল বইয়ের পাতার জ্ঞান হয়ে থাকে — এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। যিনি জানেন কিন্তু আমলে পরিণত করেন না এমন আলেমদের জন্য কুরআনে কঠোর সতর্কবার্তা রয়েছে। আল্লাহ বলেন —

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

"যাদেরকে তাওরাত বহন করানো হয়েছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি (অর্থাৎ আমল করেনি), তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধার মতো যে কিতাব বহন করে।"

[সূরা আল-জুমু'আ – ৫]

আমলহীন জ্ঞান বহনকারীকে আল্লাহ গাধার সাথে তুলনা করেছেন — যে পিঠে মূল্যবান কিতাব বহন করে অথচ তার মর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না বা কাজে লাগায় না। এ এক ভয়াবহ উপমা, যা আমলহীন আলেমের অবস্থা স্পষ্ট করে দেয়।

৩. আমলহীন ইলমের পরিণতি

রাসূল (সা.) বলেছেন — কিয়ামতের দিন সবার আগে তিন ধরনের ব্যক্তিকে নিয়ে জাহান্নামে আগুন প্রজ্বলিত করা হবে — শহীদ (যিনি লোক-দেখানো শাহাদাত বরণ করেছেন), দানশীল (যে সম্পদ দিয়েছে লোকে দানশীল বলবে বলে), এবং সেই আলেম যিনি ইলম শিখেছেন এবং কুরআন তিলাওয়াত শিখেছেন কেবল আলেম ও ক্বারী হিসেবে পরিচিত হওয়ার জন্য। রাসূল (সা.) বলেছেন —

"কিয়ামতের দিন সবার আগে তিন ধরনের ব্যক্তিকে নিয়ে জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে — তাদের একজন সেই আলেম, যে ইলম শিখেছিল লোক-দেখানোর জন্য।"

[সহীহ মুসলিম – ১৯০৫]

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, ইলম যদি ইখলাস ও আমলে রূপান্তরিত না হয়, তবে তা পরকালীন রক্ষাকবচ হওয়ার বদলে শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই জ্ঞানের সাথে সাথে ইখলাস ও আমল অপরিহার্য।

একটি বিখ্যাত হাদিসে এসেছে যে, কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার পা নড়বে না যতক্ষণ না তাকে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় — তার মধ্যে একটি হলো তার ইলম সম্পর্কে — সে তা দিয়ে কী আমল করেছে। রাসূল (সা.) বলেছেন —

وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ

"...এবং তার ইলম সম্পর্কে — সে তা দিয়ে কী আমল করেছে।"

[সুনানে তিরমিযী – ২৪১৭]

৪. ইলম রক্ষার একমাত্র পথ আমল করা

ইলম রক্ষার একমাত্র পথ আমল করা। ইলম হলো এমন এক নূর যা অন্তরে স্থায়িত হয় তখনই — যখন বান্দা ইলম অনুযায়ী আমল করে। যে ইলমের উপর আমল করা হয় না তা ক্রমশ অন্তর থেকে মুছে যায়। পূর্ববর্তী আলেমগণ বলতেন — "আমরা আমলের সাহায্যে ইলম মুখস্থ রাখতে চাইতাম।" অর্থাৎ আমলই জ্ঞানকে জীবন্ত ও স্থায়ী রাখে।

আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যারা জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে হিদায়াতের পথে চলে, তিনি তাদের হিদায়াত আরও বৃদ্ধি করে দেন। তিনি বলেন —

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

"যারা সৎপথে চলে, আল্লাহ তাদের হিদায়াত আরও বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদের তাকওয়া দান করেন।"

[সূরা মুহাম্মাদ – ১৭]

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলে আল্লাহ আরও জ্ঞান ও হিদায়াত দান করেন। অর্থাৎ আমল জ্ঞানের দরজা আরও খুলে দেয়, আর আমল না করলে জ্ঞানের দরজা ক্রমশ বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে ইলম ও আমল একটি চক্রের মতো — একটি অপরটিকে বৃদ্ধি করে এবং শক্তিশালী করে।

৫. ইলম ও আমলের পরিণতি একটিই — আল্লাহভীতি

যে ইলম আল্লাহভীতি বাড়ায় না এবং যে আমল ইলমভিত্তিক নয় — দুটিই অপূর্ণ। আল্লাহ বলেন —

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করেন তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমগণই।"

[সূরা ফাতির – ২৮]

সুতরাং সফল মুসলিম তিনিই — যিনি ইলম অর্জন করেন, সেই অনুযায়ী আমল করেন, এবং সেই আমলের ফলে অন্তরে আল্লাহভীতি ও অনুভব হয়। এটিই হলো ইলম ও

আমলের চূড়ান্ত লক্ষ্য — আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর প্রতি যথাযথ ভয় ও ভালোবাসা সৃষ্টি।

৬. সালাফদের জীবনে ইলম ও আমলের ভারসাম্য

ইলম ও আমলের আদর্শ ভারসাম্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনের জীবন। তাঁরা যা শিখতেন, সাথে সাথে তা আমলে পরিণত করতেন। তাঁদের কাছে জ্ঞান ছিল আমলের জন্য — কেবল আলোচনা বা বিতর্কের জন্য নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, সাহাবারা কুরআনের দশটি আয়াত শিখলে সেগুলোর অর্থ ও সে অনুযায়ী আমল না শেখা পর্যন্ত পরবর্তী আয়াতে অগ্রসর হতেন না। এভাবে তাঁরা একই সাথে ইলম, আমল ও আদব শিখতেন। এটিই ছিল তাঁদের সাফল্যের মূল রহস্য।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) সূরা আল-বাকারা মুখস্থ করতে কয়েক বছর সময় নিয়েছিলেন — কারণ তিনি কেবল মুখস্থ করতেন না, বরং প্রতিটি বিধান নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতেন। এ থেকে বোঝা যায়, প্রকৃত জ্ঞান পরিমাণে নয়, বরং তা কতটা আমলে রূপান্তরিত হলো তাতেই নিহিত।

আজকের যুগে আমরা প্রচুর জ্ঞান সংগ্রহ করি — বই পড়ি, লেকচার শুনি, কোর্স করি — কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকি। সালাফদের এই আদর্শ আমাদের শেখায় যে, অল্প জ্ঞান যার উপর আমল করা হয়, তা বিপুল জ্ঞানের চেয়েও উত্তম, যার উপর কোনো আমল নেই। তাই প্রতিটি তালিবুল ইলমের উচিত জ্ঞানের সাথে সাথে আমলকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া।

৪.৩ দ্বীনি ইলমের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা

আধুনিক যুগে এসে অনেকে মনে করেন দ্বীনি ইলম কেবল অতীতের বিষয়, বর্তমান যুগে এর তেমন প্রয়োজন নেই। অথচ বাস্তবতা হলো — যত যুগ এগিয়ে যাচ্ছে, দ্বীনি ইলমের প্রয়োজনীয়তা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ নতুন নতুন ফিতনা, নতুন নতুন প্রশ্ন এবং নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মানুষের সামনে আসছে, যার সঠিক সমাধান কেবল দ্বীনি ইলমের আলোকেই সম্ভব।

আজকের প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে অর্থনৈতিক লেনদেন, চিকিৎসা, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক যোগাযোগ — প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন নতুন শরয়ী প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। ব্যাংকিং সুদ, ক্রিপ্টোকারেন্সি, অনলাইন ব্যবসা, চিকিৎসাশাস্ত্রের নতুন পদ্ধতি — এসব বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হলে গভীর দ্বীনি জ্ঞান প্রয়োজন। এ থেকেই বোঝা যায়, দ্বীনি ইলম কেবল প্রাসঙ্গিক নয়, বরং অপরিহার্য।

রাসূল (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শেষ জামানায় জ্ঞানের গুরুত্ব আরও বাড়বে এবং ফিতনা থেকে রক্ষা পেতে ইলমই হবে একমাত্র আশ্রয়। তিনি বলেছেন —

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ

"অন্ধকার রাতের অংশের মতো ফিতনা আসার পূর্বেই তোমরা নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও।"

[সহীহ মুসলিম – ১১৮]

এই ফিতনাময় যুগে সঠিক ও ভ্রান্ত পথের পার্থক্য নির্ণয় করতে হলে দ্বীনি জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। যে ব্যক্তির অন্তরে দ্বীনি জ্ঞানের আলো রয়েছে, সে যত বড় ফিতনাই আসুক না কেন, তার মধ্যে অবিচল থাকতে পারে। তাই আধুনিক যুগে দ্বীনি ইলমের প্রাসঙ্গিকতা কোনো অংশে কমেনি, বরং বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমকালীন বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণের একমাত্র পথও হলো জ্ঞানের পথ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলিমরা যখন জ্ঞানের শিখরে ছিল, তখন তারা সভ্যতার নেতৃত্ব দিয়েছে। আজ সেই হারানো গৌরব ফিরে পেতে হলে আমাদের আবার জ্ঞানের পথে ফিরে আসতে হবে — দ্বীনি ও দুনিয়াবি উভয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হবে।

আধুনিক যুগে তথ্যের সহজলভ্যতা একদিকে যেমন আশীর্বাদ, অন্যদিকে তেমন চ্যালেঞ্জ। ইন্টারনেটে প্রতিদিন অসংখ্য ভ্রান্ত তথ্য, বিকৃত ব্যাখ্যা ও সংশয় ছড়ানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে একজন মুসলিমের পক্ষে সঠিক ও ভ্রান্তের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়েছে। কেবল দৃঢ় দ্বীনি জ্ঞানই পারে এই সংশয়ের সমুদ্রে একজন মুসলিমকে পথ দেখাতে। তাই আধুনিক যুগে দ্বীনি ইলমের প্রয়োজনীয়তা অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি।

বর্তমান যুগের তরুণ প্রজন্ম নানা মতাদর্শ ও সংস্কৃতির মুখোমুখি হচ্ছে, যা তাদের ঈমান ও আকীদার জন্য হুমকিস্বরূপ। নাস্তিকতা, সংশয়বাদ, ভোগবাদ — এসব আদর্শ তরুণদের আকৃষ্ট করছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তরুণদের হাতে দ্বীনি জ্ঞানের

শক্তিশালী হাতিয়ার তুলে দেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। একজন জ্ঞানসম্পন্ন তরুণ যেকোনো ভ্রান্ত মতাদর্শের মোকাবেলা করতে সক্ষম।

সুতরাং দ্বীনি ইলম কোনো সেকেলে বিষয় নয়, বরং এটি প্রতিটি যুগের, বিশেষত আধুনিক যুগের সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন। যত দিন যাবে, ফিতনা যত বাড়বে, দ্বীনি জ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা ততই বৃদ্ধি পাবে। তাই প্রতিটি মুসলিমের উচিত নিজে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও এই জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা।

৪.৪ উপসংহার

এই সমগ্র আলোচনা থেকে অকাট্যভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বীনি ইলম অর্জন প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপরিহার্য কর্তব্য। এটি কেবল একটি ধর্মীয় কর্তব্যই নয়, বরং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার মূল চাবিকাঠি। কুরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য দলিল প্রমাণ করে যে, ইলম ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না, ইবাদত শুদ্ধ হয় না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় না।

আমরা দেখেছি যে, ইসলামের প্রথম ওহীই ছিল ‘পড়ো’ — যা জ্ঞান অর্জনের প্রতি সুস্পষ্ট আহ্বান। আমরা আরও দেখেছি যে, আল্লাহ আলেমদের মর্যাদা সাধারণ মানুষের চেয়ে বহু স্তরে উন্নীত করেছেন, ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য ডানা বিছিয়ে দেন এবং গোটা সৃষ্টিজগৎ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর চেয়ে বড় সম্মান একজন মুমিনের জন্য আর কী হতে পারে।

ব্যক্তিজীবনে দ্বীনি ইলম সঠিক আকীদা গঠন করে, ইবাদতকে শুদ্ধ করে এবং অন্তরে আল্লাহভীতি জাগ্রত করে। পারিবারিক জীবনে এটি পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে, সন্তানদের সুশিক্ষা দেয় এবং দাম্পত্য জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। সামাজিক জীবনে এটি ন্যায়বিচার, হালাল উপার্জন এবং ফিতনা থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করে। আর জাতীয় ও উম্মাহগত জীবনে এটি সম্মান ও নেতৃত্বের ভিত্তি গড়ে তোলে।

আজকের যুগে যখন ফিতনা-ফাসাদ, ভ্রান্ত মতবাদ ও নৈতিক অবক্ষয় চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব আরও বহু গুণে বেড়ে গেছে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত প্রয়োজনীয় দ্বীনি ইলম অর্জন করা এবং নিজের সন্তান-সন্ততিকেও এই ইলম অর্জনে উৎসাহিত করা।

এই গবেষণার আলোকে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায় ।

প্রথমত, প্রতিটি মুসলিম পরিবারে ফরযে আইন পরিমাণ দ্বীনি জ্ঞান অর্জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, শিশুদের ছোটবেলা থেকেই দ্বীনি শিক্ষার সাথে পরিচিত করানো উচিত, যাতে তাদের ভিত্তি মজবুত হয়।

তৃতীয়ত, কর্মব্যস্ত মানুষদের জন্য অনলাইন মাদ্রাসা ও নির্ভরযোগ্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোর সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।

চতুর্থত, ডিজিটাল মাধ্যমে দ্বীনি তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই ও নির্ভরযোগ্য আলেমদের অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। পঞ্চমত, অর্জিত জ্ঞানকে কেবল তথ্য হিসেবে না রেখে আমলে রূপান্তরিত করা এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রতি যত্নবান হতে হবে। এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ — সর্বস্তরে কল্যাণ সাধিত হবে।

তবে আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ইলম অর্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল তথ্য সংগ্রহ নয়, বরং সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। কারণ যে ইলম আমলে রূপান্তরিত হয় না এবং যা অন্তরে আল্লাহভীতি জাগায় না, তা প্রকৃত ইলম নয়। তাই আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত — আল্লাহ যেন আমাদের উপকারী জ্ঞান দান করেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দেন।

পরিশেষে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করি — তিনি যেন আমাদেরকে উপকারী ইলম দান করেন, সেই ইলম অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দেন এবং তা অন্যদের কাছে পৌঁছানোর সামর্থ্য প্রদান করেন। আমীন, ইয়া রাব্বুল আলামীন।

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"হে আমার রব! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।"

তথ্যসূত্র

এই গবেষণাপত্র প্রস্তুত করতে নিম্নলিখিত মূল উৎসসমূহ থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে। আয়াত ও হাদিসসমূহের রেফারেন্স যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. আল-কুরআনুল কারীম
২. সহীহ আল-বুখারী
৩. সহীহ মুসলিম
৪. সুনানে আবু দাউদ
৫. সুনানে আত-তিরমিযী
৬. সুনানে ইবনে মাজাহ
৭. মুসনাদে আহমাদ
৮. তাফসীর ইবনে কাসির।
৯. সালাফে সালেহীনের জীবনী ও তাঁদের বিভিন্ন উক্তি সংকলন।
১০.অনান্য গ্রন্থ।